Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৃত্তিকা আক্তার

রোলঃ 2270216702309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৃত্তিকা আক্তার

রোলঃ 2270216702309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সিরাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৃত্তিকা আক্তার, আইডিঃ 2270216702309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মৃত্তিকা আক্তার

আইডিঃ 2270216702309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

নবিজীর জীবনী 5

ভুমিকা 5

জাহিলি সমাজের বৈশিষ্ট্য...7

কুরাইশদের প্রতিবাদ ও সমাধান 11

মায়ের সঙ্গে জীবন যাপন 16

হিজর ও হাতিম..22

ইসরা ও মেরাজ 37

মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্ব 47

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা 57

বীর মাওনার ট্রাজেডি...60

হুদাইবিয়ার সন্ধি..65

হুনাইন যুদ্ধের বন্দি ও মুক্তি 72

বিদায় হজ ও ভাষণ...77

মোহাম্মদ সাঃ এর শেষ জীবন ও অসুস্থতা..79

নবিজীর জীবনী

ভুমিকা

মানবজাতির ইতিহাসে এমন একটি জীবন রয়েছে যা শুধু একটি ব্যক্তির নয়- বরং একটি আদর্শের একটি বিপ্লবের,একটি দাওয়াতের প্রতিচ্ছবি। সেই জীবন হলো হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন ছিল কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা যার চরিত্র ছিলো মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

এই সিরাত গ্রন্থের সূচনা হচ্ছে সেই মহামানবের জীবনকে জানার, বুঝার এবং হৃদয়ে ধারণ করার উদ্দেশ্য। এটি শুধু একটি ঐতিহাসিক বিবরণ নয় বরং একটি আত্মিক অন্বেষণ - যেখানে আমরা খুঁজে পাব রাসুল (সাঃ) এর শৈশবের সরলতা, নবুয়তের দীপ্তি, মক্কার প্রতিকূলতা, মদিনার রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধের ন্যায় নীতি, বিজয়ের বিনয়, বিদায় হজের, মানবতা, এবং ইন্তেকালের পর উম্মতের দায়িত্ব ।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মিয় অবস্থা

তৎকালীন আরবদের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল গোত্র প্রধান। আর সে সময় খুন খারাবি এবং লুটতরাজ নিয়ে গোত্রে গোত্রে ঝগড়া ফাসাদ লেগে থাকা জাহেলী রীতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর সেই রীতি অনুসারেই প্রত্যেক গোত্র যখন সুযোগ ও সক্ষমতা পেত অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। ন্যায়-অন্যায় সব কিছু নির্নীত হত গোত্রীয় স্বার্থের নিরিখে।

গোত্র ছিল আরব সমাজের মৌলিক একক। এটি ছিল রক্ত সম্পর্কিত একটি সম্প্রদায় যেখানে সদস্যরা একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সম্মানিত। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব নেতা আইন প্রতিশোধের রীতি এবং মর্যাদাবোধ ছিল

- পরিচয়ভ েদ :একজন ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারিত হতো তার গোত্রের মাধ্যমে যেমন - কুরাইশ, বনু হাসিম, বনু উমাইয়া।
- নেতৃত্ব ও বিচার :গোত্র প্রধান (সাঈদ ছিলেন সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তিনি যুদ্ধ বিচার এবং বাইরের গোত্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করত)
- গোদ্রীয় সংঘাত ও প্রতিশোধ নীতি :

আশা বিয়া নামে পরিচিত ছিল গোত্রীয় পক্ষপাত। এটি ছিল এমন এক মানসিকতা যেখানে নিজের গোত্রের সদস্যকে সঠিক বা ভুল যাই হোক সমর্থ্য করতে হতো। প্রতিশোধের নীতি কেউ যদি অন্য গোত্রের সদস্যকে হত্যা করত তবে প্রতিশোধ নেওয়া হতো। এতে শতাব্দীকাল ধরে যুদ্ধ চলত। যেমন আউস ও খাজরাজ গোত্রের দ্বন্দ্ব।

- সামাজিক অবস্থা

গোত্রভিত্তিক সমাজ - আরবরা ছিল গোত্র ভিত্তিক জনগোষ্ঠী প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব নেতা আইন ও প্রতিশোধের রীতি ছিল ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারিত হতো তার গোত্রের মাধ্যমে।

নারীর অবস্থা - নারীরা ছিল অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত। কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত। (
সূরা তাকভীর আয়াত :৮)

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ٨

যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে,
(সূরা তাকভীর আয়াত :৯)

بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ٩

কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?
বিবাহ ছিল বহুগামী, এবং নারীর উত্তরাধিকার বা মতামতের কোন মূল্য ছিল না।
দাসপ্রথা ও শ্রেণীবিভাজন - দাস দের উপর নির্যাতন ছিল স্বাভাবিক। ধনী ও গরিবের মধ্যে ছিল চরম বৈষম্য। সমাজের শ্রেণীবিভাজন ছিল গভীর।
সামাজিক অনাচার মদ্যপান, জুয়া কবিতা প্রতিযোগিতা এবং অশ্লীলতা ছিল সামাজিক বিনোদনের অংশ জাহেলী যুগের কবিতায় এসবের ছাপ স্পষ্ট।
ইতিবাচক দিক-

- অতিথি পরায়ণতা: অতিথিকে সম্মান দেয়া ছিল ধর্মীয় দায়িত্বের মতো।
- সাহসিকতা ও বীরত্ব : যুদ্ধ ও বিপদে সাহসিকতা ছিল গর্বের বিষয়,
- স্মৃতিশক্তি ও ভাষার সৌন্দর্য : আরবরা ছিল চমৎকার কবি ও বক্তা, তাদের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রচন্ড কঠোর, যা শুন্ত বা দেখত তা হুবহু বলতে বা লিখতে পারতো।

রাজনৈতিক অবস্থা
কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব - আরব উপদ্বীপে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। একটি গোত্র ছিল স্বশাসিত। আইন ছিল গোত্র প্রধানের নির্ভর।
বহিরাগত সাম্রাজ্যের প্রভাব -

- উত্তরের রোমান সাম্রাজ্য (বাইজেন্টাইন),
- পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্য (শাসনীয়),
- দক্ষিণে হিমিয়ার ও হাবশা রাজ্য,

মক্কার রাজনৈতিক গুরুত্ব- মক্কা ছিল ধর্মীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র। কুরাইশ গোত্র কাবা নিয়ন্ত্রণ করত যা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়াত।
ইয়াসরিব (মদিনা) পরিস্থিতি -

আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলছিল। ইহুদিদের তিনটি গোত্রও ছিল - বনু কায়নুকা, বানু নাজির, বনু কুরাইযা। রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল চরম।

ধর্মীয় অবস্থা

মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা- আরবরা বহু দেবতার পূজারি ছিল। কাবায় 360 টি মূর্তি ছিল, লাত, উজ্জা, মানাত, হুবল ছিল প্রধান দেবতা। তারা বিশ্বাস করত এই দেবতারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।

বিকৃত ইব্রাহিমের রীতি - হজ তাকওয়া কোরবানি ইত্যাদি ইব্রাহিমই রীতিতে বিকৃত ঘটেছিল। তারা তাওয়াফে নগ্ন হয়ে অংশগ্রহণ করত । প্রাক ইসলামী যুগে কিছু আরব ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসারী ছিলেন যাদের বলা হতো হানিফ।

হানিফ ধর্ম - কিছু ব্যক্তি একত্ববাদে বিশ্বাস করতেন যেমন ওয়ারাকা ইবনে নওফল, উমাইয়া ইবনে আবি সালাত, জাহিদ ইবনে আমর।

ইহুদি ও খ্রিস্টান প্রভাব - ইয়াসরিবে ইহুদি। বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার - তারা পশু উৎসর্গ করতে দেবতার নামে। কুসংস্কার, জ্যোতিষ, তাবিজ, গণনা ছিল প্রচলিত ধর্ম ছিল লুকাচার ও বংশগত অভ্যাস।

জাহিলি সমাজের বৈশিষ্ট্য

জাহেলী সমাজ অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর আগমনের পূর্ববর্তী আরব সমাজ ছিল এক দৈত্য বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এক দিকে ছিল চরম অন্ধকার অন্য দিকে কিছু মানবিক গুনাবলিও ছিল যা পরবর্তীতে ইসলামের আলোয় পরিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে - (তোমরা ছিলে অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছে - সূরা আলে ইমরান আয়াত - ১০৩) (তারা কি জাহেলিয়্যাতের বিধান চায়? - সূরা মায়িদা আয়াত - ৫০) পরকাল ও স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাস - তারা বিশ্বাস করত জীবন শুধু দুনিয়ার জন্য। কালের বিবর্তনই ধ্বংস করে আল্লাহর কোনো ভুমিকা নেই।

কুরআনের বলা হয়েছে। (আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।’ বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে। সূরা আল জাছিয়া আয়াত - ২৪)

নবুয়তের প্রয়োজনিয়তা

নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই সময়ের বাস্তবতায়, যখন মানবজাতি ছিল চরম বিভ্রান্ত, নৈতিক অবক্ষয় ও অজ্ঞতার অন্ধকারে

নিমজ্জিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর আগমনের পূর্বে আর সমাজের বিচিত্রই ছিল তার প্রতিফলন।

১. মানবজাতির নৈতিক ও অধ্যাত্মিক অবক্ষয় - মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তার একত্ববাদ মানত না। তারা মূর্তি পূজা, কুসংস্কার ও লোকাচারে বিভ্রান্ত ছিল। সমাজে ছিল ব্যভিচার নারী অবমাননা, দাসপ্রথা, সুদ, জুয়া এবং শ্রেনিবিভাজন । কুরআনের বলা হয়েছে - (যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সূরা বাকারা আয়াত ২৫৭)

২. সঠিক পথের অভাব - পূর্ববর্তী নারীদের শিক্ষা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের বিভ্রান্তি ও দলাদলি ছিল। মানুষ সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে পারছিল না। তাই আল্লাহ তাআালা নতুন রসূল সাঃ প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তার আয়াত সমূহ পাঠ করে তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন।

(তিনিই উম্মীদের* মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল। সূরা জুম- আ আয়াত ০২)

৩. কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যার প্রয়োজন-

কুরআনের বহু আয়াত নির্দিষ্ট ঘটনা প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে যেমন- বদর, উহুদ, হিজরত, হুদাইবিয়া,।

সীরাত ছাড়া এসব আয়াতের বাস্তবতা অনুধাবন করা যায় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম জীবনই কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা।

(আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের কাছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। সূরা নাহল আয়াত ৪৪)

৪. আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন -

মানুষ এমন একজন আদর্শ ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধানে ছিল, যিনি হবেন ন্যায় পরায়ণ, দয়ালু, সাহসী এবং আল্লাহর প্রতিনিধি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র ছিল ধৈর্য, ক্ষমতা, সততা, নেতৃত্ব এবং মানবতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ।

(তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ সূরা আহজাব আয়াত ২১)

৫.সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের প্রয়োজন-

গোত্রভিত্তিক বিভাজন, যুদ্ধ, ঘোষণা ও বিশৃঙ্খলা ছিল সমাজের বাস্তবতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মদিনার একটি ন্যায় ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ছিল মানবাধিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং সামাজিক সততা। নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা ছিল সময়ের দাবি, মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান উপহার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। ছিলেন সমাজ সংস্কার রাষ্ট্রনায়ক মানবতার পথপ্রদর্শক। তার সিরাত অধ্যায়ন মানে শুধু ইতিহাস জানা নয় বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আলোকবর্তিকা খুঁজে পাওয়া।

বংশ পরিচয় ও পরিবার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কুরাইশ বংশের সন্তান কুরাইশ ছিল আরবের সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রভাবশালী গোত্র। যারা কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও মক্কার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। রাসুল সাঃ এর পূর্ণ নাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাভ ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নাদর ইবনে কিনানা। হাদিসে এসেছে- তার বংশধারা ইসমাইল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছায়।

(আল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর সন্তানদের মধ্যে থেকে ইসমাইলকে বেছে নিয়েছেন, ইসমাইলের বংশ থেকে কিনানা, কিনানা থেকে কুরাইশ, কুরাইশ, থেকে বনি হাসিম, এবং বনি হাশিম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন - সুনানে তিরমিজি হাদিস - ৩৬০৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - (আল্লাহ গোত্র ও বংশগুলো বাছাই করেছেন এবং আমাকে সব সবচেয়ে উত্তম বংশের সৃষ্টি করেছেন। - তিরমিজি হাদিস - ৩৬০৭)

পারিবারিক মর্যাদা

কুরাইশ গোত্র আরবের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও ধর্মীয় মর্যাদা শীর্ষে ছিল। রোমান সম্রাট হিমাক্লিয়াসের সামনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীকার করেছিলেন। (তিনি আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক - সহীহ বুখারি হাদিস ৭)

মহান আল্লাহ তাকে মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত পরিবারে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তার দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয় এবং মানুষ তাকে সহজে অনুসরণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর বংশ পরিচয় ও পরিবার ছিল আরব সমাজের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। তার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়দিকেই ছিল সম্মানিত বংশধারা। আল্লাহ তাকে এমন পরিবারের জন্ম দিয়েছেন, যা ধর্মীয়ভাবে প্রভাবশালী। এ কারণেই তার নবুয়ত আরব সমাজের দ্রুত গ্রহণযোগ্য লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

আব্দুল মুত্তালিব জীবন নেতৃত্ব প্রভাব

১. নাম পরিচয় - আসল নাম শাইবা ইবনে হাশিম, উপনাম আব্দুল মুত্তালিব (মুত্তালিবের দাস) কারণ তার চাচা মুত্তালিব তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং লোকেরা তাকে মুত্তালিবের দাস মনে করে এই নামেই ডাকতে শুরু করে। বংশ কুরাইশ গোত্র, বনু হাসিম উপগোত্র, পিতা হাশিম ইবনে আব্দে মানাফ।

১. শৈশব ও মক্কায় আগমন - জন্ম হয় ইয়েসরিবে (বর্তমান মদিনা) চাচা মুত্তালিবের সাথে মক্কায় আসেন। প্রথমে লোকেরা তাকে দাস মনে করলেও পড়ে তার বংশ পরিচয় প্রকাশ পায়, এবং তিনি সম্মান লাভ করেন।

৩. নেতৃত্ব ও মর্যাদা - কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেতা। তার নেতৃত্বে কুরাইশ গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি ছিলেন কাবা ঘরের সেবক (সাদান) হাজীদের পানির ব্যবস্থা, নিরাপদ ও খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতেন। তার দানশীলতা সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা তাকে সাইয়্যিদুল বাথা (মক্কার নেতা) উপাধি এনে দেয়।

জমজম কূপ পুনরাবিষ্কার

জমজম কূপ ইসলামের ইতিহাসে এক মহাব বরকতময় নিদর্শন। এর সৃষ্টি হয়েছিল হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর স্ত্রী বিবি হাজেরার আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শিশু ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর সময়, তখন আল্লাহর কুদরতে ইসমাইল আলাইহি সালামের পায়ের আঘাত থেকে পানি ফুটে বের হয়। তবে সময়ের প্রবাহে কূপটি এক সময় বালু ও ধ্বংসাবশেষ চাপা পড়ে যায়। আব্দুল মুত্তালিব এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, তাকে একটি কূপ খননের নির্দেশন দেওয়া হচ্ছে। স্বপ্নে বলা হয় তুমি তাইবা বাররাহ মাদনূনা খনন কর । পরিশেষে স্পষ্টভাবে বলা হয়, তুমি জমজম খনন কর। আব্দুল মুত্তালিব তার এক মাত্র ছেলে হারিসকে নিয়ে কাবার কাছে খনন শুরু করেন। কুরাইশরা প্রথমে বিরোধিতা করে কারণ তারা মনে করতো কাবার আশেপাশে খনন করা অসম্মানজনক, কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব ধিরো থাকেন এবং খনন চালিয়ে যান। খননের সময় হঠাৎ জমজম কূপের প্রাচীন পাথরের প্রাচীর ও পানির ধারা প্রকাশ পায়। কুরাইশরা তখন বুঝতে পারে এটি সেই ঐতিহাসিক কূপ, যা ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসমাইল আলাইহি সালামের যুগ থেকে বরকতময় হিসেবে পরিচিত। আব্দুল মুত্তালিব কুপটি পরিষ্কার করে পুনরায় চালু করেন, এবং হাজীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। কুরাইশরা দাবি করে জমজম কূপের দায়িত্ব সবার হওয়া উচিত। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব বলেন আল্লাহ আমাকে এইটি পুনরাবিষ্কারের সৌভাগ্য দিয়েছে তাই এর দায়িত্ব আমার। পরবর্তীতে কুরাইশরা তার নেতৃত্ব মেনে নেয়। এভাবেই জমজম কূপের দায়িত্ব বনো হাসিম পরিবারের হাতে আসে, যা পরবর্তীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারে মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে।

(জমজমের পানি যে নিয়তে পান করবে আল্লাহ তাকে সেই নিয়ত অনুযায়ী উপকার দান করবেন - ইবনে মাজাহ হাদিস - ৩০৬২।)

জমজম কূপ আজও অবিরাম পানি দিচ্ছে যা আল্লাহর এক অনন্য নিদর্শন। জমজম কূপের পুনরাবিষ্কার শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয় বরং এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহ তার নিদর্শনকে যুগে যুগে সংরক্ষন করেন।

আব্দুল মোত্তালিব এর মানত

আব্দুল মুত্তালিব জমজম কূপ পুনরাবিষ্কাের সময় একমাত্র পুত্র হারিসের সহায়তায় কাজ করেন। তখন তিনি অনুভব করেন যদি তার আরো পুত্র থাকতো তবে কাজ সহজ হতো, এবং তাকে রক্ষা করত, তখন তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেন। হে আল্লাহ যদি তুমি আমাকে দশটি সুস্থ সবল পুত্র দাও, যারা আমার রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তবে আমি তাদের একজনকে তোমার নামে কুরবানী করব।

আস্থার বহিঃপ্রকাশ - অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব এর পরবর্তীতে দশ পুত্র জন্ম নেয়। হারিস, আবু তালিব, হামজা, আব্বাস, আব্দুল্লাহ প্রমুখ। তিনি তার মানত পূরণের প্রস্তুত হন, এবং কাবা ঘরের কাছে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে চান কে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত হবে। লটারিতে আব্দুল্লাহ এর নাম উঠে যিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর, প্রিয় এবং
সম্ভাবনাময় পুত্র। আব্দুল মুত্তালিব সিদ্ধান্তে অটল থাকেন কারণ এটি ছিল আল্লাহর নামে মানত।

কুরাইশদের প্রতিবাদ ও সমাধান

কুরাইশরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এবং বলেন মানব কোরবানি আমাদের রীতিতে নেই। তারা পরামর্শ দেয় একজন রমণী যিনি গণনা ও ভাগ্য নির্ধারণে পারদর্শী তার কাছে যেতে। তিনি বলেন দশটি উট নিয়ে লটারি কর যদি উটের নাম উঠে তবে উট কুরবানী কর যদি আব্দুল্লার নাম উঠে উট সংখ্যা বাড়াও।

প্রথমে দশটি উট নিয়ে লটারি করা হয়, আব্দুল্লাহ নাম উঠে। উট সংখ্যা বাড়িয়ে ২০, ৩০, অবশেষে ১০০ উট পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন উটের নাম উঠে, এবং আব্দুল মুত্তালিব ১০০ উট কুরবানী করেন। এই ঘটনা আরবদের মধ্যে এত বিখ্যাত হয় যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে বলা হতো (ইবনে যাবিহাইন) দুই কুরবানীর পুত্র (ইসমাইল আব্দুল্লাহ)।

আব্দুল্লাহ বিবাহ ও মৃত্যু

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত ও সুদর্শন যুবক। আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আব্দুল্লাহকে বিয়ে দেওয়ার জন্য কুরাইশের সম্ভ্রান্ত পরিবার খুঁজতে থাকেন। তিনি পছন্দ করেন আমিনা ইবনে ওয়াহাব কে যিনি ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের সম্ভ্রান্ত নারী। আমিনার পিতা ওয়াহাব ইনবে আব্দে মানাফ ছিলেন মক্কার অভিজাতদের মধ্যে একজন।তাদের বিবাহ হয় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে কুরাইশ গোত্রের উপস্থিতিতে। আমিনা ছিলেন সুন্দর বুদ্ধিমতী ও চরিত্রবান নারী। এই বিবাহকে কুরাইশরা আকাশের মিলন বলে অভিহিত করেছিল কারণ উভয় পরিবারই ছিল মর্যাদাসম্পন্ন।

-আব্দুল্লাহ ছিলেন বনু হাসিমের মুক্তা আর আমিনা ছিলেন বোনুজ জোহরার চাঁদ।

বিবাহের কিছুদিন পর আব্দুল্লাহ ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সিরিয়া সফরে যান। সফর শেষে ফেড়ার পথে মদিনায় (ইয়াসরিব) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি নানার বাড়ি বনু নাজ্জার গোত্রে ছিলেন যেখান থেকে নবী করিম সাঃ এর মাতৃকুলের সম্পর্ক। আব্দুল্লাহ মদিনা ইন্তেকাল করেন মাত্র ২৫ বছর বয়সে নবীজির জন্মের কয়েক মাস আগে। তার মৃত্যুর সংবাদে আমিনা গভীরভাবে শোকাহত হন। আব্দুল্লাহকে মদিনার দারুল নাবিগা নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম জন্মগ্রহণ করেন পিতৃহীন অবস্থায়।

(তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। - সূরা দুহা আয়াত ৬)

আব্দুল্লার বিবাহ ও মৃত্যু নবীজির জীবনের সূচনা লগ্নে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল তার অকাল মৃত্যু নবীজিকে জন্ম থেকেই এতিম করে, যা পরবর্তীতে তার চরিত্রে ধৈর্য সহানুভূতি ও আদর্শ গঠনের সহায়তা করে।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা

হস্তীবাহিনীর ঘটনা যা ইসলামী ইতিহাসে আমল ফীল নামে পরিচিত ছিল, এক অলৌকিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যেখানে আল্লাহ তাআলা কাবা ঘরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এই ঘটনাটি রসূল সাঃ এর জন্মের বছরই সংঘটিত হয়।

আব্রাহা ছিল ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসক, যিনি আল কুল্লাইস নামে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন আরবরা যেন কাবাঘর ছেড়ে তার গির্জায় হজ করে। কিন্তু আরবরা কাবা ঘরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিল ফলে আব্রাহারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এক আরব ব্যক্তি গির্জায় অপমানজনক আচরণ করলে আব্রাহা ক্ষিপ্ত হয়ে কাবাঘর ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। এবং আব্রাহা বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন যার নেতৃত্বে ছিল একটি বিশাল হস্তি - নাম

মাহমুদ। বাহিনী তে ছিল বহু সৈন্য, হাতি ও অস্ত্র। উদ্দেশ্য ছিল কাবা ধ্বংস করে আরবদের ধর্মীয় কেন্দ্র ধ্বংস করা।

আব্রাহা মক্কার উপকনটি পৌঁছালে কুরাইশরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব আব্রাহার সাথে সাক্ষাৎ করে তার উট ফেরত চায় আব্রাহা বিস্মিত হয়ে বলেন, তুমি কাবার জন্য চিন্তিত নও? আব্দুল মুতালিব বলেন - (আমি উটের মালিক কাবার মালিক আল্লাহ তিনি কাবাকে রক্ষা করবেন।- ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী)

অতঃপর আব্রাহা বাহিনী কাবার দিকে অগ্রসর হলে হস্তি মাহমুদ চলতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সেখানেই বসে পড়ে। আল্লাহ আকাশ থেকে পাখি (আবাবিল) পাঠান যারা ঠুঁটে ও পায়ে করে পাথর এনে নিক্ষেপ করেন, সৈন্যদের ধ্বংস করে দেয়।

(তুমি কি দেখনি তোমার রব কিভাবে হাতিওয়ালা বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। তিনি তাদের উপর ঝাকে ঝাকে পাখি পাঠিয়েছেন, যারা তাদের উপর পুরানো কাকড় নিক্ষেপ করেছে। - সূরা ফীল আয়াত ১-৩)

সৈন্যরা ধ্বংস হয়। আব্রাহা নিজেও ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইয়েমেনের ফিরে গিয়ে মারা যায়। হস্তীবাহিনীর ঘটনা ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক অলৌকিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধু কাবা রক্ষার বাহিনী নয় বরং আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ। নবুয়তের পূর্ব প্রস্তুতি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের বার্তা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের পূর্বে তার মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহাব একটি বিশেষ স্বপ্ন দেখেছিলেন। যা ছিল অলৌকিক গভীর অর্থবোধক এবং নবীজির আগমনের মহত্ব বহনকারী। আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তখন গর্ভবতী, এবং নবীজির জন্মের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এক রাতে তিনি একটি আলোকোজ্জল স্বপ্ন দেখেন যা তাকে অভিভূত করে তুলে। স্বপ্নে তিনি দেখতে পান আমি এমন এক আলো দেখেছি যাতে সিরিয়া প্রাসাদ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই স্বপ্ন নবীজির আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও বিশ্বজনীন নেতৃত্বের পূর্বাভাস বহন করে। আলো ছড়িয়ে পড়া অর্থ তার দাওয়াত শুধু আরব নয় সারা বিশ্বের জন্য। আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপ্ন ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর আগমনের অলৌকিক বার্তা এটি প্রমাণ করে, তার জন্ম ছিল পূর্ণনির্ধারিত আল্লাহর পরিকল্পিত এবং মানবতার মুক্তির সূচনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর জন্ম ছিল মানব ইতিহাসের এক মহান ঘটনা যা অন্ধকারে নিমজ্জিত জাহিলি সমাজের আলোর সূচনা করেছিল। তার জন্মের সময়, স্থান, পারিবারিক পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সবই ছিল নবুয়তের জন্য প্রস্তুত এক মঞ্চ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মক্কার বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ ই রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্দীক্ষণে সুবহে সাদেকের সময় জন্ম লাভ করেন। ইংরেজি পঞ্জিকা মতে তারিখ কি ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০ শে বা ২১ শে এপ্রিল।
(আমি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছি। -সহিহ মুসলিম হাদিস ১১৬২)
ঐতিহাসিক ও সিরাতকাররা নবীজির জন্মের সময় কিছু অলৌকিক আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন - কসড়ায়ে পারস্যের ১৪ টি মিনার ধসে পড়ে। সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে যায়, যা পারসের পূজিতে হত , আগুনের মন্দিরে চিরন্তর আগুন নিভে যায়। আসমান ও জমিনে আলো ছড়িয়ে পড়ে।
তার জন্মের সময় এমন আলো উদ্ভাসিত হয় যা পূর্বে -পশ্চিমকে আলোকিত করে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নাম রাখা হয় মোহাম্মদ যার অর্থ যার (প্রশংসা করা হয় বারবার) । এটি ছিল আরব সমাজের নতুন নাম, যা আগে খুব কম ব্যবহৃত হত। দাদা আব্দুল মুত্তালিব বলেন - আমি চাই আসমান ও জমিনে তার প্রশংসা হোক।
নবীজির মাতার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সর্বপ্রথম দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা। ওই সময় তার কুলে যে সন্তান ছিল তার নাম ছিল মাসরুহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পূর্বে সুওয়াইবাহ হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব কে এবং পরে আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাহখজুমিকে ও দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর জন্ম ছিল শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয় বরং এটি ছিল মানবতার মুক্তির সূচনা তার জন্মের সময়ের পরিবেশ পারিবারিক পটভূমি এবং অলৌকিক আলামত সবই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুয়তের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছিলেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর শৈশব
ইসলাম পূর্ব আরবে অভিজত পরিবারগুলো তাদের নবজাত সন্তানদের মরু অঞ্চলের দুধ মায়ের কাছে লালন পালনের জন্য দিত, যাতে তারা বিশুদ্ধ ভাষার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও শক্তিশালী ঘটন পায়। বনু সা'দ গোত্রের হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুদ মায়ের দলে মক্কায় আসেন নবজাত শিশুদের গ্রহণ করতে। তিনি ছিলেন দরিদ্র তার পরিবারের উট, ছাগল এমনকি সন্তানও ছিল দুর্বল ও ক্ষুধার্ত। হালিমা প্রথমে নবীকে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ তিনি ছিলেন এতিম, কিন্তু অন্যথায় কোন শিশু না পাওয়াই ফিরে এসে এতিম শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে নিয়ে যান।মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে গ্রহণের পরপরই তার উট দ্রুত চলতে শুরু করে দুধের পশুর দুধ দিতে শুরু করে। পরিবারের শান্তি ও সমৃদ্ধ ফিরে আসে।

শৈশবের আচরণ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর শৈশবের আচরণ ছিল অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ। তিনি কখনো অন্য শিশুদের মতো কান্নাকাটি করতেন না কখনো অপবিত্রতা সৃষ্টি করতেন না। হালিমা বলেন - তিনি ছিলেন এমন শিশু যার ঘুম, হাসি ও নীরবতা ছিল প্রশান্তির প্রতীক।

বক্ষ বিদারণ - এভাবে দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বনু সাদ গোত্রের অবস্থান করতে থাকলেন। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনা মতে, দ্বিতীয় দফায় বনুসাদ গোত্রের অবস্থানকালে কয়েক মাস পর পক্ষান্তরে মহাক্কিক গণের বর্ণনামতে জন্মের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছর তার বক্ষ বিতরণের ঘটনাটি ঘটে। নবীজী শিশুদের সাথে খেলছিল, হঠাৎ জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয় তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুয়ে তার বুক চিরে হৃদয় বের করেন। হৃদয় থেকে একটি কালো অংশ বের করে বলেন এটি শয়তানের অংশ, এরপর তা জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে হৃদয়কে শুদ্ধ করে পুনরায় স্থাপন করেন।

(জিবরীল আলাই সাল্লাম আমার কাছে এসে আমার বুক চিরে হৃদয় বের করলেন তা ধুয়ে শুদ্ধ করে পুনরায় স্থাপন করলেন।- সহিহ মুসলিম হাদিস - ২৩৩৩)

এই ঘটনা দেখে অন্যান্য শিশুরা ভয় পেয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দুধ ভাই দৌড়ে গিয়ে হালিমাকে জানায়। আমার ভাইকে একজন সাদা পোশাক দাড়ি লোক ধরে ফেলেছে। হালিমা ও তার স্বামী ভয় পেয়ে যান ভাবেন হয়তো কোন অশরীরী তাকে আঘাত করেছে। সিদ্ধান্ত নেন, নবীজীকে তার প্রকৃত মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এর কাছে ফিরিয়ে দেবেন। অতঃপর হালিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে নিয়ে মক্কায় আসেন, তিনি আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সব ঘটনা খুলে বলেন শক্কুস সদর, অলৌকিকতা নবীজির আচরণ ও বরকত। আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু কথাগুলো গভীর ভাবে শুনেন এবং বলেন। - (আমার সন্তানকে ভয় পেয়ো না তার জন্য রয়েছে এক মহান ভবিষ্যৎ। - ইবনে হিসাব সিরাতুন্নবী।)

আমিনা বুঝতে পারেন তার সন্তান সাধারন কেউ নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হবেন। অতঃপর হালিমার সাদিয়া নবীজিকে বিদায় দেন অশ্রুসিক্ত চোখে কারণ তিনি ছিলেন তার জীবনের বরকতের উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তাঁর দুধ মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রাখেন সারা জীবন। পরবর্তীতে তিনি হালিমকে আমার মা বলে সম্মানিত করেন, এবং তার পরিবারের খোঁজ খবর রাখতেন।

মায়ের সঙ্গে জীবন যাপন

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তার জন্মমাতা আমিনার কাছে ফিরে আসেন এবং মক্কায় তার সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। আমিনা ছিলেন কোমল হৃদয়ের শিক্ষিত ও মর্যাদাপূর্ণ নারী। তিনি নবীকে স্নেহ ও যত্নে লালন করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর বয়স তখন প্রায় ছয় বছর আমিনা তাকে নিয়ে মদিনা সফরে যান, যেখানে তার স্বামী (আব্দুল্লাহ) কবর রয়েছে। এই সফরে তাদের সঙ্গে ছিলেন উম্মে আইমান যিনি পরবর্তীতে নবীর দাসী ও অভিভাবক, সাহাবিয়া। তারা মদিনায় বনু নাজ্জার গোত্রে কিছুদিন অবস্থান করেন, যা ছিল আমিনার মাতৃকুল। মদিনা থেকে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং সেখানে ইন্তেকাল করেন। শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য নিজ চোখে দেখেন । এটি ছিল তার জীবনের প্রথম বড় শোক।

(আমার মা আমিনা আবওয়ায় মারা যান আমি তাকে নিজ হাতে কবর দিয়েছিলাম। - ইবনে সাদ তাকাব্বাতুল কুবরা)

আমিনার মৃত্যুর পর উম্মে আয়মান নবীকে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও স্নেহশীল নারী, যিনি নবীর জীবনের পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দাদা, আব্দুল মুত্তালিব এর তত্ত্বাবধান

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জন্মের আগে তার পিতাকে হারিয়েছেন, এবং যখন তার ছয় বছর বয়স তখন তার মা আমিনাকে হারান, আর তিনি পুরোপুরি এতিম হয়ে পড়েন। তারপর তাকে আশ্রয় দেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব, যিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের নেতা এবং মক্কার অন্যতম ব্যক্তি। আব্দুল ম‍ুত‍্তালিব নবীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তাকে নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সব সময় নিজের পাশে রাখতেন।

(আব্দুল মুত্তালিব নবীজীকে কাবা ঘরের পাশে বসাতেন, যেখানে কুরাইশ নেতারা বসতেন, কেউ তাকে সরাতে চাইলে তিনি বলতেন, আমার এই সন্তানকে কিছু বলো না সে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। - -ইবনে হিসাম সিরাতুন্নবী)

দাদার মৃত্যু

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর যখন ৮ বছর বয়সী তখন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার প্রিয় নাতিকে চাচা আবু তালিবের কাছে দিয়ে যান। আবু তালিব ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র এবং নবীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। আবু তালিব নবিকে নিজের সন্তানদের মতো নয় বরং আরো বেশি ভালবাসতেন ও

যত্নে লালন পালন করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র কিন্তু তার হৃদয় ছিল উধার। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রতি তার স্নেহ এত গভীর ছিল যে তিনি কখনো তাকে একা ছাড়তেন না। এমনকি সফেরও সঙ্গে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবে তিনি বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত পালিত হতে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কৈশোরের তিনি পশু চাড়ানের কাজ করতেন তিনি বলেন - (আমি মক্কার লোকদের জন্য কিছুদিন ভেড়া চড়িয়েছি। সহিহ বুখারি হাদিস ২২৬২)

বাহিরা রাহিব

নবী মুহাম্মদ সাঃ যখন প্রায় 12 বছর বয়সী তখন তিনি তার চাচা আবু তালিবের সঙ্গে একটি ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। সফরের পথে তারা বসরা নামক স্থানে পৌঁছান, যা ছিল সিরিয়া সীমান্তের একটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহর। কাফেলা বসরায় পৌঁছে গির্জার পাশে তাবু স্থাপন করে।

বাহিরে ছিলেন একজন নেস্তারায়ী খ্রিস্টান সন্ন্যাসী। তিনি বাইবেল ও পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ অধ্যায়ন করতেন। তার কাছে ছিল এমন পান্ডুলিপি যেখানে শেষ নবীর লক্ষণ ও পরিচয় উল্লেখ ছিল। সাধারণত তিনি কাফেলার সঙ্গে দেখা করেন না। বাহিরা লক্ষ্য করেন, মেঘ নবীর মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে এবং গাছের ছায়া নবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে - যা ওলৌকিকতার নিদর্শন। তিনি একটি ভোজের আয়োজন করেন এবং নবীকে ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি নবীর চেহারা, আচরণ, চলাচল ও কথাবার্তা দেখে নিশ্চিত হন এই শিশুই ভবিষ্যতের সেই নবী যার কথা তার ধর্মগ্রন্থে আছে। বাহিরা আবু তালিব কে বলেন - এই শিশু হবে শেষ নবী। আমি তার আলামত আমার ধর্মগ্রন্থে পড়েছি।

তিনি আবু তালিবকে সতর্ক করেন।

তাকে রোমান ও ইহুদি শাসকদের কাছ থেকে রক্ষা কর যদি তাকে চিনে ফেলে ক্ষতি করতে পারে।

এ কথা জানার পর আব্বু তালিব তাকে কয়েকজন গুলাম এর সঙ্গে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। (আর রাহীকুল মাখতুম পৃষ্ঠা ৪৬)

ফিজার যুদ্ধ

ফিজার যুদ্ধ হয়েছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কৈশোরে সংঘটিত একটি গোত্রীয় সংঘাত। তখন আনুমানিক তার বয়স ১৫ কিংবা বিশ ছিল বনু কিনা না গোত্রের বাররায নামক এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লান গোত্রের তিনজনকে হত্যা করে। তাকে কেন্দ্র করে ফিজার যুদ্ধ ঘটিত হয়। ফিজার অর্থ অন্যায় বা নিষিদ্ধ, কারণ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় আরবের পবিত্র মাসে, যে মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। এক পক্ষের ছিল কুরাইশ ও বনু

কিনানাহ অন্যপক্ষে ছিল ক্বায়স আইলান, হাওয়াজিন গাতাফান প্রভৃতি গোত্র। নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সরাসরি এই যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি। তবে তিনি তার চাচাদের তীরের আঘাত থেকে রক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুজুল

হিলফুল ফুজল ছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কৈশোর ও যৌবনের সময় সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চুক্তি, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এবং নিপীড়নের পাশে দাঁড়ানোর এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এইটি ইসলামী ইতিহাসের ন্যায় বিচার ও মানবাধিকারের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

মক্কায় একজন ইয়েমেনি (জুনুবি) ব্যবসায়ী এসেছিলেন বাণিজ্য করতে, তিনি আজ ইবনে ওয়াল নামক এক প্রভাবশালী কুরাইশ নেতার কাছে পণ্য বিক্রি করেন, কিন্তু আস ইবনে ওয়াইল তার মূল্য পরিশোধ না করে প্রতারণা করেন। যেহেতু ব্যবসায়ী ছিলেন বহিরাগত ও গোত্রহীন তাই তিনি বিচার চাইতে পারছিলেন না। তিনি কাবা চত্বরে গিয়ে মানুষের সামনে নিজের দূর্দশা প্রকাশ করেন এবং সাহায্য চান।

চুক্তির সূচনা - অন্যায় দেখে কিছু সম্মানিত কুরাইশ নেতা একত্রিত হন, এবং একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক চুক্তি করেন এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ানো, মক্কায় নেই প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বলদের অধিকার রক্ষা করা। এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী গোত্রগুলো ছিল বনু হাশিম বনু জোহরা বনু তায়ম। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তরুণ ছিলেন এবং বনু হাশিম এর প্রতিনিধি হিসেবে এই চুক্তিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন । এই চুক্তিকে ফুজুল বলা হয় কারণ এটি ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অতিরিক্ত ন্যায় সঙ্গত ও মর্যাদাপূর্ণ উদ্যোগ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ইসলাম গ্রহণের পরও এই চুক্তির প্রশংসা করেন তিনি বলেন- (আমি এমন একটি যুক্তিতে অংশ নিয়েছিলাম যা আমার কাছে লাল উটের চেয়ে প্রিয়। ইসলাম আসার পরও যদি এমন চুক্তির ডাক আসে আমি তাতে অংশ নেব। - মুসনাদে আহমদ হাদিস - ২৩৩৪৫)

আল আমিন

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল আমিন উপাধি দেওয়া হয়েছিল, তার অসাধারণ সততা, বিশ্বস্ততা, ও ন্যায়তার জন্য। এই উপাধি তিনি নবুয়াতের বহু আগে অর্জন করেন এবং মক্কার গোত্রীয় সমাজে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। হিলফুল ফুজুল গঠন ও তার পরপরই জবরদস্ত কুরাইশ নেতার কাছ থেকে বহিরাগত মজলুমের হক আদায়ের ঘটনা চারিদিকে তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে মুখে তিনি আল আমিন অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও আমানতদার বলে অভিহিত হতে থাকেন। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী,

নম্র ও বিশ্বস্ত, তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, প্রতারণা করতেন না, বরং মানুষের আমানত রক্ষা করতেন নিখুঁতভাবে। এই গুণাবলীর কারণে মক্কার লোকেরা তার প্রতি গভীর আস্থা রাখতো। এই উপাধি প্রমাণ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল এতটাই উজ্জ্বল যে শত্রুরাও তার সততা অস্বীকার করতে পারেনি।

ব্যবসায়িক জীবন

কুরাইশ গোত্রের মধ্যে ব্যবসা ছিল সম্মানজনক পেশা। নবীজির সততা, আমানত -দারিতা ও ন্যায়পরায়ণতা তাকে সমাজে আল আমিন বিশ্বাসযোগ্য নামে পরিচিত করে তুলে। কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তাকে পুঁজি দিয়ে ব্যবসায়িক সফরে পাঠাতেন। তিনি কখনো প্রতারণা করতেন না, লভ্যাংশের হিসাব সঠিকভাবে দিতেন এবং দরিদ্রদের সাহায্য করতেন।

খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মক্কার একজন ধনী ও বিদুষী ব্যবসায়ী মহিলা। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সততার কথা শুনে অধিক লভ্যাংশের শর্তে তাকে ব্যবসায়িক সফরের প্রস্তাব দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার চাচা আবু তালিবের পরামর্শে প্রস্তাবের সম্মত হন।

সিরিয়া সফর ও মায়সারার অভিজ্ঞতা -

খাদিজা রাদি আল্লাহু আনহু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে ব্যবসায়িক কাফেলার নেতৃত্বে সিরিয়া বসরা অঞ্চলে সঙ্গে দেন তার বিশ্বস্ত দাসী মায়সারাকে। যিনি সফরের পর্যবেক্ষণ ও সহকারী ছিলেন। সফরে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও সৌজন্যপূর্ণ, আচরণ মায়সারা কে মুগ্ধ করে, এবং তিনি লক্ষ্য করেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম অন্য ব্যবসায়ীদের মতো প্রতারণা করেন না। মেঘ তাকে রোদ থেকে আড়াল করে গাছের ছায়া তার দিকে ঝুকে পড়ে। লেনদেন অত্যন্ত সফল ও লাভজনক, এবং নবীজী অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী, ও ধৈর্যশীল।

(আমি এমন চরিত্র এমন সততা এমন অলৌকিকতা আগে দেখিনি - ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী)

সফর শেষে মায়সারা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সব ঘটনা খুলে বলেন। তিনি আলামত বর্ণনা করেন। মায়সারার প্রতিবেদন ছিল নবীজির ব্যক্তিত্বের সামাজিক স্বীকৃতি। তার স্বাক্ষ্য খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মনে ভালোবাসা ও আস্থা জন্ম দেয়, এটি ছিল নবীজির বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের সূচনার পূর্ব প্রস্তুতি। মায়সারা ছিলেন একজন নীরব সাক্ষী যার পর্যবেক্ষণ সততার বিবরণ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্রে মহিমা তুলে ধরে । তার ভূমিকা নবীজির জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বাক খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে বিবাহ ঘটিত হওয়ার পেছনে সহায়ক হয়।

বিবাহ

খাদিজা বিনতে ওয়াইলিদ ছিল কুরাইশ গোত্রের এবং আসাদ বংশের তিনি ছিলেন একজন ধনী, সম্মানিত বুদ্ধিমতী ও ব্যবসায়ী নারী। ইতিপূর্বে পর পর দুইজন স্বামী মৃত্যুবরণ করায় মক্কার সেরা নেতৃবৃন্দ তার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। কিন্তু তিনি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সিরিয়া সফরে যান, এবং দ্বিগুণ লাভ নিয়ে ফিরে আসেন। অধিকন্ত তার দাস মায়সারাহর কথাবার্তা থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মিষ্ট ভাসিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা ভাবনা, আমানত ও হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধে ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, এবং তাকে স্বামী রূপে পাওয়ার এক গোপন বাসনা ক্রমেই তার মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তিনি নিজ অন্তরের গোপন বাসনা ও ব্যাকুলতার কথা তার বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনাব্বিহ এর নিকট ব্যক্ত করেন। অতঃপর তার বান্ধবী নাফিসা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর চাচা আবু তালিব এর পরামর্শে প্রস্তাবে সম্মত হন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এবং বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দুমাস পর। তিনি সহদর্মিনী খাদিজা কে মোহরানা স্বরূপ ২০ উট প্রদান করেন। ওই সময় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স হয়েছিল 40 বছর আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ২৫ বছর। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং তিনি ছিলেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর প্রথমা সহধর্মিনী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম নিঃস্ব ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বৈবাহিক জীবনের সাথে সাথে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছিলেন। ওদিকে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন জীবন সঙ্গী লাভ করেছিলেন যে, তিনি যতই এ নিয়ে গর্ব করতেন মনে হতো হক আদায় হচ্ছে না। নিজের ধন-সম্পদ, জায়গায়, সম্পত্তি, এবং ব্যবসায়িক পুঁজি সবই নবীজির খেদমতে সঁপে দেন। নবীজির সন্তুষ্টি ছিল তার সন্তুষ্টি।

সন্তান-সন্তানাদি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মোট তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিল। ইব্রাহিম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গর্বজাত সন্তান। নবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় আবুল কাশেম।তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহর, আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল ত্বাইয়িব এবং ত্বাহির। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন মুসলিম হয়েছেন

এবং মুহাজিরদের মর্যাদা ও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত কন্যাগণ সকলি পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

কাবা গৃহ পুনঃনির্মাণ

আল আমিন মোহাম্মদ সাঃ এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন কুরাইশগণ কাবা গৃহে পূর্ণনির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ইব্রাহিম ও ইসমাইলের হাতে গড়া ন্যুনাধিক আড়াই হাজার বছরের স্মৃতিধন্য এই মহা পবিত্র গৃহ সংস্কারের ও পূর্ণ নির্মাণের পবিত্র কাজে সকলে অংশীদার হতে চায়। কাবা গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ অলংকারআদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইব্রাহিমী যুগ থেকেই তাবা গৃহে নয় হাত উঁচু চার দেয়াল বিশিষ্ট গড় ছিল। গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যেকোনো মুহূর্তে তা ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।তাছাড়া সেই বছরই মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে কাবাহ মুখি জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ার কাবা গৃহের দেয়ালে চরম অবনীতির ঘটে এবং যে কোনো মুহূর্তে তা ধসে পড়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলে কাবা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে উদ্দেশ্য তা পূর্ণনির্মাণের জন্য। কাবা গৃহের পূর্ণনির্মাণের উদ্দেশ্যে কুরাইশের নেতৃবৃন্দ বসে স্থির করেন, যে এর নির্মাণ কাজে কোনরূপ হারাম মাল বা অর্থ ব্যয় করা হবে না। তারা বলে - (হে কুরাইশগণ! তোমরা এর নির্মাণ কাজে তোমাদের পবিত্র উপার্জন ব্যয় কর, ব্যভিবিচারের অর্থ, সুদের অর্থ, কারো প্রতি জুলুমের অর্থ মিশ্রিত করোনা। - (ইবনে হিশাম ১/২৯৪))

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার চাচা আব্বাসের সঙ্গে নির্মাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারা পাহাড় থেকে পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন। (সহী বুখারী - ৩৮২৯। কিতাবুল মানাবিক বাবু বুনায়াফিল কাবা।) নির্মাণ আরম্ভ হওয়ার পর দেয়ালের গাঁথুনি যখন হাজর আসয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে এবং এই মোবারক পাথর স্থাপনের সময় হয়। তখন নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণকারী সব গোত্র প্রচন্ড ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। প্রত্যেকেই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়। বনু আদি এবং বনু আব্দুদ দাঁড়ের ক্রোধ ক্ষুব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তারা আরবের যুদ্ধ প্রতিজ্ঞার নিয়ম অনুযায়ী রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এ মর্মে কসম খায় যে, তাদেরকে যদি হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করায় সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে তারা সবাই মিলে অধিকার আদায়ের যুদ্ধ করতে করতে জান দিয়ে দিবে। এদিকে তাদের প্রতিপক্ষের গোসসা ও কম ছিলনা। পরিস্থিতির রক্তক্ষয় যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এ সময় কিছু দূরদূরসি বিচক্ষণ লোক তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করতে সক্ষম হয়, এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মসজিদে হারামে এখন সর্বপ্রথম

যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সেই বর্তমান সংকট নিরসন করবে। তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই সমস্বরেন বলতে থাকে মোহাম্মদ আল-আমিন এসে গেছে। আমরা তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এই সংকট মোকাবেলায় একটি চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাদেরকে একটি চাদর আনতে বললেন। চাদরের মধ্যখানে হাজরে আসওয়াদ রেখে প্রতিটি গোত্রের একজন নির্ধারিত ব্যক্তিকে চাদরের এক কোনায় ধরার জন্য বললেন। সবাই মিলে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর নবীজি নিজ হাতে তা কাবায় স্থাপন করেন, এভাবেই অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও ইনসাফের সঙ্গে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে যায়। (সীরাতে ইবনে হিশাম - ১/১৯০-১৯৯)

হিজর ও হাতিম

হিজর অর্থ আড়াল বা আবদ্ধ স্থান। এটি কাবা শরীফের উত্তর-পশ্চিম পাশে একটি অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল ঘেরা এলাকা, যা কাবার মূল কাঠামোর বাইরে অবস্থিত, আঁকার প্রায় ৬-৭ হাত চওড়া, অধবৃত্তাকার। কাবা শরীফ যখন পূর্ণনির্মাণ করা হয় (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নবুয়তের পূর্বে) তখন কুরাইশ গোত্রের অর্থ সংকটের কারণে মূল কাঠামো ছোট করে নির্মাণ করা হয়। মূল কাঠামোতে জায়গা না হয় হিজর অংশটি বাইরে রেখে দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। হিজর অংশটি কাবার অভ্যন্তরভুক্ত বলে গণ্য হয়। তাই হিজরের ভেতর নামাজ পড়লে তা কাবার ভেতরে নামাজ পড়ার সমতুল্য।

হাতিম অর্থ ভাঙ্গা বা ধ্বংসপ্রাপ্ত। অনেক সময় হিজর ও হাতিম শব্দ দুটি একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তবে কিছু আলেমের মতে হাতিম বলতে বুঝানো হয় হিজরের দেয়াল সহ পুরো অংশ, যা কাবার মূল কাঠামো থেকে আলাদা করা হয়েছে। এটি ঐতিহাসিক ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ হিসেবে পরিচিত। যেটি কাবার মূল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত্র

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নবুয়াতের পূর্ববর্তী জীবন ছিল সততা ন্যায়পরায়ণতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের পরিপূর্ণ। তার চরিত্র এতোটাই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ছিল যে মক্কার মানুষ তাকে আলামিন (বিশ্বাসযোগ্য) উপাধিবিতে ভূষিত করে।এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ছিলেন আরববাসী গনের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষ্য দিতেন যে, তিনি অভাবগ্রস্থদের বুঝা বহন করতে নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন

করতেন। ন্যায্য দাবিদের নীতিনি সহায়তা করতেন এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য মশহুর ছিলেন। (সহীহুল বুখারী প্রথম খন্ড ৩ পৃষ্ঠা) গোত্র সমাজ ও মানুষের মনোভাব বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে ছিলেন। আরবের জাহিলিয়াত যুগে ধর্মীয় অস্থিরতা মূর্তিপূজা শির্ক ও নৈতিক অবক্ষয় ছিল সাধারণ। এই প্রেক্ষাপটে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র যিনি অন্তরে একত্ববাদী চিন্তা লালন করতেন, এবং সমাজের অন্যায় ও অভিজারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদে ছিলেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ধর্মীয় অনুভুতি ও বিশ্বাস ছিল জাহিলিয়াতের অন্ধকারে এক আলোকবর্তিতা। তার একত্ববাদী চিন্তা শিরক বিরোধী অবস্থান, ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান তাকে নবুয়তের জন্য প্রস্তুত করে তুলে।

হেরা গুহায় ধ্যান ও নবুয়তের সূচনা

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নবুয়তের সূচনা ছিল এক ঐশী অভিজ্ঞতা, যা মানবজাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। নবুয়তের পূর্বে তিনি হেরা গুহায় নির্জনে ধ্যান করতেন সমাজের অন্যায়, অবিচার ও অশান্তি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতেন। এই ধ্যান ও আত্মিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তিনি নবুওয়াতের জন্য প্রস্তুত হন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রথম ওহী লাভ করেন। মক্কার উত্তর পূর্বে, জাবালের নূর পাহাড়ে কাবা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে নির্জন শান্ত ধ্যানের জন্য উপযোগী স্থান। সেখানে তিনি রামাদান মাসে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে খাবার পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের অন্যায়, শিরক, নারী নির্যাতন, দাসত্ব ও গোত্রীয় বিভাজন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি তাওহীদের চিন্তা লালন করতেন এবং মূর্তি পূজা থেকে বিরত ছিলেন। হেরা গুহায় তিনি তাসাক্কুর (চিন্তা) ও তাদাব্বুর (গভীর ভাবনা) করতেন। এটি ছিল নবুয়তের পূর্বে তার আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির কেন্দ্র। হেরা গুহায় ধ্যান ও নবুয়তের সূচনা ছিল নবী মুহাম্মদ সা. এর জীনের এক ঐশী মোড়। এটি মাত্র তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, বীং মানবজাতির জন্য এক নতুন যুগের সূচনা।

প্রথম ওহি লাভ ও নবুয়তের সূচনা

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন তার বয়স ৪০ বছর ২১ শে রামাদান সোমবার ক্বদরের রাত্রি, একাকী থাকা অবস্থায় একদিন তার সামনে এক ফেরেশতা আবির্ভূত হলেন। তিনি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে বর্মশেষ রিসালাত এবং সমগ্র পৃথিবীর পথনির্দেশের দায়িত্ব রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে সঁপে দিতে এসেছিলেন। তিনি এসেই নিজের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, হে মোহাম্মদ আমি জিব্রাইল আর আপনি আল্লাহর রাসূল। ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে বললেন পড়, তিনি বললেন আমি পড়তে জানি না, অতঃপর

তাকে বুকে চেপে ধরলেন ও বললেন পড়ো কিন্তু একই জবাব পড়তে জানিনা। এভাবে তৃতীয়বারের চাপ শেষে তিনি পড়তে শুরু করলেন।

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ١

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,

خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে।

ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣

পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤

যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে,

عَلَّمَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না, (সূরা আল আলাক আয়াত ১-৫)।
এটাই ছিল সর্বশেষ উম্মতের প্রতি আখেরি নবীর মাধ্যমে প্রেরিত প্রথম আসমানী বার্তা। অতঃপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, আমাকে বস্ত্রবৃত কর আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহু তাকে শায়িত অবস্থায় বস্তাবৃত করলেন, এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তার অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশান্ত হলে তিনি তার সহধর্মিনীকে বলেন (আমার কি হলো) তার অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের ভাবলক্ষ করে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীকে বলেন, আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না আপনি এতিমদের আশ্রয় দেন, দরিদ্রকে সাহায্য করেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তারপর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফল এর কাছে যান। ওয়ারাকা ইবনে

নওফল ছিলেন খ্রিস্টান পন্ডিত। কিন্তু ওই সময় বার্ধক্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে হেরা গুহার বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি সব কথা শুনে বললেন- এ তো সেই ফেরেশতা যাকে আল্লাহ মুসার প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়! যদি আমি সেদিন তরুণ থাকতাম। হায়! যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম যেদিন তোমার স্বজাতি এবং সুগোত্রীয় লোকেরা তোমার উপর নানাভাবে জুলুম অত্যাচার করবে তোমার দেশ থেকে বহিস্কার করবে। এই কথা শুনে মোহাম্মদ সাঃ চমকে উঠে বললেন, ওরা কি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ তা নিয়ে ইতিপূর্বে এমন কেউ আগমন করেননি। যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি অতঃপর ওয়ারাকা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন , যদি তোমার সেই দিন আমি পাই তবে আমি তোমাকে সাধ্যমতে সাহায্য করব। (সহীহ বুখারি হাদিস -৪৯৫৩ মুসলিম হাদিস - ১৬০ মিশকাত হাদিস - ৫৮৪১)

ওহীর বিরতিকাল

নবুয়তের সূচনা হয় হেরা গুহায় প্রথম ওহি নাজিলের মাধ্যমে। জিবরাইল (আঃ) এসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহি প্রদান করেন। কিন্তু এই প্রথম ওহির পর কিছু সময়ের জন্য ওহি নাজিল বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়কালকে বলা হয় ফাতরাতুল ওহি বা ওহির বিরতিকাল। এটি নবীজির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ নবীজিকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন এবং ওহির গুরুত্ব উপলব্ধি করান।

প্রথম ওহির পর কিছু সময়ের জন্য ওহি নাজিল বন্ধ হয়ে যায়। হাদীসের বর্ণনায় এসেছে:

আয়েশা (রাঃ) বলেন:

(“এরপর কিছু সময়ের জন্য ওহি বন্ধ হয়ে যায়। নবীজি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি কয়েকবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই জিবরাইল (আঃ) এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন: ‘হে মুহাম্মদ, তুমি আল্লাহর রাসূল।’ তখন তাঁর মন শান্ত হয়।”

— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩)

এই বিরতিকাল ছিল নবীজির জন্য মানসিক প্রস্তুতির সময়। আল্লাহ তাঁকে নবুয়তের দায়িত্বের জন্য দৃঢ়তা ও ধৈর্য দান করেন।

ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে বিরতিকালের দৈর্ঘ্য নিয়ে। কেউ বলেন কয়েক দিন, কেউ বলেন কয়েক মাস, আবার কেউ বলেন দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, এটি ছিল কয়েক মাসের বিরতিকাল।

ইবন ইসহাক বলেন:

(“প্রথম ওহির পর কিছু সময়ের জন্য ওহি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আবার ওহি নাজিল শুরু হয়।”

— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫২)

পুনরায় ওহী নাযিল

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কয়েক মাস কোন নতুন ওহি লাভ করেননি। এই বিরতিকাল ছিল এক মানসিক ও আত্মিক সংকটের সময়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনরায় ওহী নাযিল হওয়ায় নবীকে অসুস্থ করে এবং তার নবুয়তের দায়িত্ব কে সুসংহত করে তুলে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রথম ওহী নাযিলের অসুবিধা থেকে মুক্ত হয়ে যখন মন মানুষিকতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, ওহী গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন তখন জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ওহী নিয়ে আগমন করলেন। সহিহুল বুখারীতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন - আমি যখন পথ ধরে চলছিলাম এমন সময় আমি আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখি যে সেদিনের সেই ফেরেশতা আসমানও যমিনের মধ্যবর্তী এলাকায়, কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি ভয়ে বিস্ময়ে আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল, অতঃপর দ্রুত বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বলি আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে দাও। কিন্তু না অল্পক্ষনের মধ্যেই গুরুগম্ভীর স্বরে ওহি নাযিল হলো। - হে চাদরবৃত উঠো মানুষকে (আল্লাহর) ভয় দেখাও, তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষনা কর। তোমার পোশাক পবিত্র রাখো, অপবিত্রতা পরিহার করা। (মুদ্দাছছির ৭৪/১-৫) এর পর ওনির অবতর চালু হয়ে গেল। - (মুখারী হা / ৪৯২৬; মুসলিম হাদিস - ১৬১; মিশকাত হাদিস ৫৮৪৩)

ওহি ও ইলহাম

ওহি ও ইলহাম ইসলামি পরিভাষায় দুটি ভিন্ন ধারণা। ওহি শুধু মাত্র নবীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য বার্তা, আর ইলহাম সমাধান মানুষের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অনুপ্রেরণা বা চিন্তা। ওহির আভিধানিক অর্থ গোপন ইশারা, নির্দেশ বা বার্তা। পরিভাষাগত ফেরেশতা (বিশেষত জিবরাইল আ.) এর মাধ্যমে পৌঁছায়। এর উদ্দেশ্য মানব-জাতিকে হেদায়াত দেওয়া শরিয়তের বিধান পৌঁছানো। উদাহরণ - কুরআনে বলা হয়েছে। -

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ ۞
وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا
١٦٣

আমি তোমার কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার আগের নাবীগণের নিকট ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম, আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর আর ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম আর আমি দাঊদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম।- (সূরা আন- নিসা আয়াত ১৬৩)।
মুহাম্মদ সা. এর নবুয়তের সূচনা হয় ওহির মাধ্যমে। - (সূরা আল আলাক আয়াত ১-৫)
ইলহামের আভিধানিক অর্থ অন্তরে কোনো চিন্তা বা বার্তা প্রক্ষেপন করা। পরিভাষাগত অর্থ আল্লাহ পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরে ভালো বা মন্দ চিন্তা প্রেন করা। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, আত্মিক অনুভূতি বা সতর্কতা। উদাহরণ - (

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨

অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।
(সূরা আশ শামস আয়াত ৮)

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧

আমি মূসার মায়ের প্রতি ওয়াহী করলাম যে, তাকে স্তন্য পান করাতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে আশঙ্কা করবে, তখন তুমি তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে, আর তুমি ভয় করবে না, দুঃখও করবে না, আমি তাকে অবশ্যই তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব আর তাকে রসূলদের একজন করব।
(সূরা আল কাসাস ৭)
ওহি হলো নবুয়তের ভিত্তি, যা আল্লাহর নবীদের মাধ্যমে মানবজাতিকে পথ দেখাতে পাঠান। ইলহাম হলো ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা, যা আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে প্রেরন করেন। ইসলামি চিন্তায় ওহি ও ইলহাম উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ তবে ওহি সর্বোচ্চ মর্যাদার ও নির্ভরযোগ্য বার্তা।
ওহীর প্রকারভেদ
ওহি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রসূলদের প্রতি প্রেরিত বার্তা যা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য অবতীর্ণ হয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ওহীর বিভিন্ন প্রকারভেদ পাওয়া যায়, যা নবীদের প্রতিবার্তা প্রেরণের পদ্ধতির ভিন্নতা নিদর্শন করে।
১. সত্য স্বপ্ন -নবীদের নবুয়তের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে যা তিনি রাতে দেখতেন তা দিনের আলোয় সত্যে পরিণত হতো। এটিই ছিল নবুয়তের পূর্ব প্রস্তুতির অংশ।

২.অন্তরে ওহী প্রবেশন - ফেরেশতা জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবীর অন্তরে কোনো বার্তা প্রেরণ করতে, বাহিক্যভাবে দেখা যেত না কিন্তু অন্তরে দৃঢ়ভাবে অনুভব করতেন-(সহীহ বুখারী হাদিস ৩)

৩. ফেরেশতা গোপনে কথা বলতেন - ফেরেশতা নিজেকে প্রকাশ না করে কেবল শব্দ শুনাতেন, আর নবীজি তা শুনে গ্রহণ করতেন।

৪.ফেরেশতা দৃশ্যমান রূপে উপস্থিত হয়ে কথা বলতেন - বিশেষত জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম মানুষরূপে এসে কথা বলতেন যেমন দিহইয়া কালভির রুপে জিব্রাইল আলাই সাল্লাম এর আগমন।

৫.ঘন্টার শব্দের মত ভারী ওহী - মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলতেন এটি ছিল সব চেয়ে কঠিন ওহি। শব্দটি ঘন্টার মত হতো যা শেষ হলে বার্তাটি স্পষ্ট হতো।

৬.আল্লাহর সরাসরি কথা বলা -কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ সরাসরি নবীর সঙ্গে কথা বলতেন (মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তুর পাহাড়ে আল্লাহর কথা বলা) সূরা ত্বা- হা আয়াত ১১-১৪)

ওহীর প্রকারভেদ গুলো নবুয়তের গুরুত্ব গভীরতা বৈচিত্র্য কে তুলে ধরে। আল্লাহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে নবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যা তাদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়েছে।

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার

নবুয়তের মহান দায়িত্ব লাভের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মানবজাতি কে সত্যের পথে আহবান করার জন্য যাত্রা শুরু করেন। তবে এই আহবান ছিল না কোন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত বিপ্লব, বরং ছিল এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা -যা তিন বছর ধরে মক্কার অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে নিঃশব্দে ধৈর্য এবং গভীর কৌশলে। ৬১০খ্রিস্টাব্দে হেরা গুহায় প্রথম ওহি লাভের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ধীরে ধীরে তার নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধুদের মাঝে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে শুরু করেন। তিনি জানতেন, মক্কার সমাজ মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত, গোত্রীয় অহংকার এর বিভ্রান্ত এবং সত্যের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। তাই দ্বীনি প্রকাশ্য আহবান নয়, বরং গোপন দাওয়াতের পথ বেছে নেন। ওই সময়ে মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াতের মূল বার্তা ছিল -

- এক আল্লাহর ইবাদত
- মূর্তি পূজার পরিত্যাগ
- নৈতিকতা সত্তা ও মানবিকতা

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার দাওয়াতের জন্য একটি নিরিবিলি স্থান নির্বাচন করেন- দারুল আরকাম। এটিই ছিল সাহাবী আরকাম ইবনে আবুল আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়ি, যা আবু কুবাইস পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এই ঘরেই রাসুলুল্লাহ সাঃ

তার সাহাবীদেরকে কুরআনের শিক্ষা দিতেন, ঈমানের মর্ম বুঝাতেন, এবং ইসলামের আদর্শ ঘরে তুলতেন।

ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল

ইতিহাসের পাতায় কিছু নাম থাকে যেগুলো শুধুই স্মরণীয় নয় তারা হয়ে উঠে আদর্শ, পথপ্রদর্শক, এবং বিশ্বাসের প্রতীক। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যখন নবুয়তের মহান দায়িত্ব লাভ করেন, তখন তিনি একা ছিলেন, নিঃসঙ্গ ছিলেন, কিন্তু তার হৃদয় ছিল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার পরিপূর্ণ। সেই মুহূর্তে যারা তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যারা অন্ধকার সমাজে ঈমানের আলো জ্বালিয়েছিলেন, তারা ছিলেন ইসলামের প্রথম কবুলকারী দল -আল সাবিকুন, আল আউওয়ালুন।

নবুয়তের প্রথম দিনগুলোতে ইসলাম ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, নিঃশব্দ এক বিপ্লব। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রথমে তার নিকটতম ও বিশ্বস্ত মানুষদের কাছে সত্যের আহ্বান পৌঁছে দেন। এই আহব্বানে যারা সারা দ েন তাদের ঈমান ছিল গভীর তাদের সাহস ছিল দৃঢ়, এবং তাদের ত্যাগ ছিল অতুলনীয়।

- খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর স্ত্রী জীবনের প্রথম সঙ্গী এবং নবুয়তের প্রথম সমর্থক, নবী করিম সাঃ যখন প্রথম ওহি লাভ করে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরে ফিরে আসেন তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সান্তনা দেন, সাহস দেন, তিনি ছিলেন প্রথম নারী মুসলিম, যার ঈমান ছিল নিঃস্ব ভালোবাসা ও পূর্ণ আস্থার প্রতিচ্ছবি।

- আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর চাচাতো ভাই, তখন মাত্র ১০ বছর বয়স।তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর আহবানে সারা দেন এবং ইসলামের প্রথম শিশু মুসলিম হিসেবে ইতিহাসের স্থান করে নেন। তার ঈমান ছিল নিষ্পাপ, তার সাহস ছিল অটল।

- আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যিনি ছিলেন সত্যের প্রতিনিধিত্ব প্রাণ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার দাওয়াতের মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট সাহাবী ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন। তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয় সিদ্দিক যিনি সর্বপ্রথম নবীর সত্যতা বিশ্বাস করেন।

- জায়েদ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাস,পরে মুক্ত হস্ত দত্তক পুত্র। তিনি ছিলেন প্রথম মুক্ত ব্যক্তি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ঈমান ছিল স্বাধীনতার প্রতীক, তার ভালোবাসা ছিল নবীর প্রতি নিঃস্বার্থ

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারীরা হল ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু - তৃতীয় খলিফা, নম্রতা ও দানশীলতার অনন্য আব্দুর রহমান

ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবসায়িক সততা ও দানশীলতার প্রসিদ্ধ। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের বীর। নবীর জন্য নিজেকে ঢাল বানিয়ে ছিলেন। সাঈদ ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম মুসলিমদের অন্যতম, যার পরিবার ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল।

এই প্রথম দলটি ছিল ইসলামের ভিত্তি নির্মাণকারী। তাদের ঈমান, ত্যাগ,এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসা। ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তারা ছিলেন সেই অগ্রদূত, যাদের সাহসিকতা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে রইল।

সালাতের নির্দেশনা

সালাতের নির্দেশনা ইসলামের অত্যাধুনিক ভিত্তি ও মানবিক শুদ্ধির এক অনন্য আহ্বান। এটি শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং একজন মুসলিমের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, যা তাকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত রাখে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ। ইসলামের সূচনা লগ্নে যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন সমাজ ছিল নৈতিক অবক্ষয় নিমজ্জিত, আত্মিক প্রশান্তি ছিল দুর্লভ।এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে যে প্রথম নির্দেশনা গুলোর একটি প্রধান করেন, তা ছিল সালাত - আত্মশুদ্ধির এক অনুশীলন, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণে স্থায়ীভাবে যুক্ত রাখে। নবুয়তের শুরুর দিকে কুরআনের আয়াতে সালাতের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়। - তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা করো সন্ধ্যায় ও সকালে - (সূরা গাফির আয়াত ৫৫)

এই আয়াতের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা ও স্মরণে নিমগ্ন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটি ছিল সালাতের সূচনা লগ্ন যা পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

ওযু ও সালাতের শিক্ষা - প্রথম ওহির পর জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে ওযু করার পদ্ধতি শেখান, এবং সালাত আদায়ের নিয়মাবলী শিক্ষা দেন। এটাই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর জন্য আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের সূচনা, যা তাকে নবুয়তের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করেন। হিজরতের পূর্বে সালাত ছিল সংক্ষিপ্ত -দু রাকাত করে আদায় করা হতো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন - শুরুতে সালাত বাড়িতে ও সফরে ছিল দু'রাকাত করে -(সহিঃ মুসলিম হাদিস -৬৮৫। আবু দাউদ হাদিস - ১১৯৮। ফিক্কহুস সুন্নাহ ১/২১১)

হিজরতের পর সালাতের রাকাত সংখ্যা পূর্ণাঙ্গভাবে নির্ধারিত হয়, এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়।

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ

ইসলামের সূচনা লগ্নে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তিন বছর ধরে গোপনে সত্যের দাওয়াত প্রচার করেন। এই সময় তিনি তার নিকটতম আত্মীয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত সাহাবীদের মাঝে এক আল্লাহর ইবাদতের আহবান পৌঁছে দেন। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় যখন ঈমানের আরো কিছু হৃদয়ে জ্বলে ওঠে, তখন আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে নির্দেশ দেন -এবার সত্যের বার্তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার সময় এসেছে। (

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ٢١٤

আর আপনার নিকটস্থ জাতি গোষ্ঠীকে সতর্ক করুন -)(সূরা আশ শুআরা আয়াত ২১৪)

উক্ত আয়াত ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর এক স্পষ্ট নিদর্শন তার দাওয়াত আর গোপন থাকবে না বরং তা হবে প্রকাশ্য ও দৃঢ় এবং সাহসিকতার পূর্ণ।

সাফা পাহাড়ে আহ্বান

তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল—কোনো বিপদ বা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানাতে হলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সবাইকে ডাকতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সাফা পাহাড়ে উঠে দাঁড়ান। এটি ছিল মক্কার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি উঁচু পাহাড়। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি গোত্রে গোত্রে ডাক দেন। হে বনু ফিহর! হে বনু আদি! হে বনু কুরাইশ! তোমরা যদি জানতে, এই পাহাড়ের পেছনে একটি বাহিনী তোমাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তাহলে কি আমার কথা বিশ্বাস করতে? - (সহীহ বুখারী হাদিস - ৪৭৭০)

সবাই একসঙ্গে উত্তর দিল:

"হ্যাঁ, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব, আপনিতো আল- আমিন । আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন - তবে জেনে রাখো, আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন শাস্তির পূর্বাভাসদাতা। তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ মুসলিম হাদিস ২০৮)

এই আহ্বানের পরপরই নবীজির চাচা আবু লাহাব ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন:

"তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এজন্যই আমাদের এখানে ডেকেছ?"

এরপর আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবের বিরুদ্ধে সূরা নাজিল করেন:

"আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও অর্জিত বস্তু তাকে কোনো কাজে আসবে না। সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।"

— সূরা আল-মাসাদ, আয়াত ১–৩

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত মক্কার সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা করে। কুরাইশরা বুঝতে পরে, এই বার্তা তাদের মূর্তিপূজা, বংশীয় গৌরব ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করছে। ফলে তারা মুসলমানদের উপর চালায় - শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন, সামাজিক বয়কট, সম্পত্তি হরন, জীবননাশের হুমকি।

বিলাল ইনবে রাবাহ রা. একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস, যিনি আহাদ, আহাদ, বলে এক আল্লাহর ইবাদতে অটল থাকে।তার মালিক উমাইয়া ইবনে খালাফ তাকে গরম বালুতে শুইয়ে পাথর চাপিয়ে রাখে।(তিনি শুধু বলতেন আহাদ আহাদ- (ইবনে হিসাব সিরাত গ্রন্থ))

সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রথম শহীদ দম্পতি। তাদের পুত্র আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। - (সুমাইয়া ছিলেন প্রথম নারী, শহীদ যাকে আবু জাহল বর্ষা দিয়ে হত্যা করে। - আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসীর)

আম্মারা ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এতটাই নির্যাতন করা হয় যে তিনি একবার মুখে এমন কিছু বলে ফেলেন, যা তার অন্তরের ঈমানের বিপরীত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন -

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًۭا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ١٠٦

কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে।-(সূরা নাহল আয়াত ১০৬)

হজ যাত্রীগণকে বাধা দেওয়ার বৈঠক

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করেন, তখন মক্কার কুরাইশ নেতারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা বুঝতে পারেন, ইসলামের বার্তা যদি হজযাত্রীদের কাছে পৌঁছে যায়, তবে তা আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কারণ হজের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্র মক্কায় সমবেত হতো। তাই কুরাইশরা নবীজির দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য গোপন বৈঠক আহ্বান করে।

এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তলিব ইবনে মুগীরা নামক কুরাইশ নেতা ও অভিজাত্যর বাড়িতে। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, যিনি কুরাইশদের মধ্যে মতো প্রতিষ্ঠায় আগ্রহি ভূমিকা পালন করে। বৈঠকে উপস্থিত নেতারা বলেন। -হজের মৌসুমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাই সালাম তার দাওয়াত প্রচার করবেন আমাদের উচিত এমন একটি কথা ঠিক করা, যা আমরা সকলেই বলবো, যাতে আগত যাত্রীরা তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। -(সিরোতে ইব্রাহিম খন্ড এক পৃষ্ঠা - ২৮৯-২৯০আরবি সংস্করণ)
তারা বিভিন্ন প্রস্তাব দেন যেমন- তাকে কবি, যাদুকর ও পাগল বলা হোক, কিন্তু অলীর বলেন। - না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কবি নন, কথা কবিতার মতো নয়। তিনি জাদুকরও নন,তার ভাষা যাদুর মত নয় বরং তার কথা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে।-

إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ٤٠

যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল (আঃ)]-এর (বহন করে আনা) বাণী।

وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖۚ قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ ٤١

তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না,

وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٖۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٤٢

এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নসীহত লাভ করো না।

تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٣

এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ,
—(সূরা আল হাক্কাহ আয়াত ৪০-৪৩)
অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেন তাকে জাদুকর বলা হবে। কারণ তার কথা মানুষকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অতঃপর বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরাইশরা হজের মৌসুমে বিভিন্ন পথে অবস্থান নেয়, এবং আগত যাত্রীদের সতর্ক করে বলেন। -

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٞ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمۡ عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُكُمۡ وَقَالُواْ
مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٞ مُّفۡتَرٗىۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ٤٣

তাদের সম্মুখে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে- এটা তো এমন একজন মানুষ, যে তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ‘ইবাদাত করত তাথেকে

বাধা দিতে চায়। তারা আরো বলে যে, এটা মনগড়া মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য যখন কাফিরদের নিকট আসে তখন তারা বলে- এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।
—(সূরা সাবা আয়াত ৪৩)
তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াতকে পুরনো উপকথা, ভ্রান্তচিন্তা, বলে অপবাদ দিতে থাকে।

সামাজিক বয়কট

ইতিহাসের পাতায় কিছু অধ্যায় থাকে, যেগুলো শুধু বয়কট নয় -তা হয়ে উঠে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও ঈমানের প্রতীক। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এক আল্লাহর ইবাদতের আহবান নিয়ে মক্কার জনপদে দাঁড়ান, তখন তার বার্তা সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ করে। কুরাইশগণ বুঝতে পারে, এই বার্তা তাদের নেতৃত্ব, বংশীয় গৌরব ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ফলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা ছিল সামাজিক বয়কট এক নির্মম ও অমানবিক সিদ্ধান্ত। ইসলামের ইতিহাসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ী ছিল সংগ্রাম, সহনশীলতা ও আত্মিক দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি। তবে মক্কার কুরাইশদের দ্বারা আরোপিত সামাজিক বয়কট ছিল তার জীবনের অন্যতম কঠিনতম পরীক্ষা।

ইসলামের দাওয়াত যখন মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছাতে শুরু করে, তখন কুরাইশ নেতারা নবী করীম সাঃ এর প্রভাব ও ইসলামের প্রসার দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তারা বুঝতে পারেন, এই ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক নয় বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বার্তা বহন করছে। তাই তারা নবী মুহাম্মদ সাঃ এর গোত্র বনু হাশিম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বয়কট ঘোষণা করে।

কুরাইশরা একটি লিখিত চুক্তি তৈরি করে, যা কাবা শরীফে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই চুক্তিতে ছিল - বনু হালিমের সঙ্গে বিয়ে, ব্যবসা লেনদেন, কথাবার্তা ও সহানুভূতির নিষেধাজ্ঞ। মুসলিমদের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ, তাদের সমাজ থেকে এক ঘরে করে রাখার চুক্তি হয়।

এই নিষ্ঠুর যুক্তির কার্যকর হয় শিবে তালিব নামক একটি সংকীর্ণ উপত্যকায়, যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সহ মুসলিমরা আশ্রয় নেন। বয়কটকালীন জীবন-যাপনের সময়কাল ছিল প্রায় তিন বছর। মুসলিমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পান,কখনো শুকনো পাতাও খেতে বাধ্য হয়। শিশুদের কান্না উপত্যকার বাইরে পর্যন্ত পৌঁছায় । বনু হাশিমের অমুসলিম সদস্যরা ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর প্রতি অনুগত্য দেখিয়া বয়কট ভঙ্গ করেননি।

অতঃপর তিন বছর পর, কুরাইশদের মধ্যে কিছু সচেতন ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি, এই চুক্তির অমানবিকতা উপলব্ধি করেন। তারা এর বিরোধিতা করেন এবং চুক্তি বাতিলের দাবী তোলেন। মহান আল্লাহর কুদরতে, কাবায় ঝুলানো চুক্তি পত্রটি উইপোকায় খেয়ে ফেলেন, শুধু আল্লাহ শব্দটি অবশিষ্ট থাকে। ওই অলৌকিক ঘটনা কুরাইশদের মনে প্রভাব ফেলে এবং অবশেষে বয়কট প্রত্যাহার করা হয়।

শোকের বছর আবু তালিব ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিদায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত জীবন ছিল এক অবিরাম সংগ্রামের ধারা। যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আল্লাহর প্রতিনির্ভরতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা অনন্য প্রান্ত স্থাপন করেছে। তবে নবুয়তের দশম বছর ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বেদনাবিদুর অধ্যায়। এই বছরেই তিনি হারাম তার দুই প্রিয়তম সহচর - চাচা আবু তালিব এবং তার স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে। ইতিহাসে এই বছরকে বলা হয় আমুল হুজন অর্থাৎ শোকের বছর।

আবু তালিব ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর চাচা, অভিভাবক ও শৈশব থেকে তার রক্ষা কর্তা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও তিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রতি ছিলেন অগাধ ভালবাসায় পূর্ণ এবং সর্বদা তাকে কুরাইশদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতেন। নবুয়তের দশম বছরে, দীর্ঘ অসুস্থতার পর আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যু ছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার পতন। কুরাইশরা বুঝে যায়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর উপর আর কোন গোত্রীয় রক্ষাকবজ নেই। ফলে তাদের নির্যাতন আরও তিব্রো হয়ে ওঠে।

আবু তালিবের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হারান তার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দুঃখে ছিলেন সান্তনা, সংকটে ছিলেন সাহস, এবং দাওয়াতের পথে ছিলেন নিরবিচার সমর্থন। তার মৃত্যু ছিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয়ের গভীর এক শূন্যতা, যা কোন মানবিক সম্পর্ক পূরণ করতে পারেননি।

এই দুই মৃত্যু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জীবনে এক দৈত্য শোখের ছায়া ফেলেছিলেন। একদিকে রাজনৈতিক রক্ষা কবজের পতন, অন্যদিকে আত্মিক আশ্রয়ের অবসান। তবুও তিনি পূর্বনির্বরতায় স্থির। তিনি দাওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হননি, বরং এই শোককে রূপান্তর করেন আত্মশুদ্ধি ও দাওয়াতের দৃঢ়তায়।

তাইফ সফর ও প্রতিক্রিয়া

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দীর্ঘদিন দাওয়াত চালানোর পরও কুরাইশদের বিরোধিতা ও নির্যাতন ক্রমশ বেড়ে যায়। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় চাচা আবু

তালিব ও স্ত্রী খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর নবীজি এক গভীর দুঃখের সময় অতিক্রম করেন। এই কঠিন সময়ে তিনি মক্কার বাইরে গিয়ে দাওয়াতের নতুন সুযোগ খুঁজতে তাইফ শহরে সফর করেন।

তাইফ ছিল মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। সেখানে বসবাস করত বনু সাকিফ গোত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা করেছিলেন, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে মক্কার বিরোধিতার বিপরীতে একটি শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া যাবে।

নবীজি তাইফে গিয়ে বনু সাকিফের তিন প্রধান নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন:

- আবদে ইয়ালাইল ইবন আমর
- মাসউদ ইবন আমর
- হাবিব ইবন আমর

তিনি তাঁদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও নবুয়তের সত্যতা তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর দাওয়াতকে উপহাস করে প্রত্যাখ্যান করেন।

নেতাদের প্রত্যাখ্যানের পর তাঁরা শহরের সাধারণ মানুষ ও দাসদের উস্কে দেন। তারা নবীজিকে শহর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য পাথর ছুঁড়ে আক্রমণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত অবস্থায় শহর থেকে বের হয়ে আসেন।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন:

"নবীজি তাইফ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসেন। তাঁর জুতা রক্তে ভিজে যায়।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩২৩১)

এই কঠিন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে এক হৃদয়স্পর্শী দোয়া করেন:

"হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, শক্তির অভাব এবং মানুষের কাছে আমার হীনতার অভিযোগ তোমার কাছে করছি। হে দয়াময়! তুমি দুর্বলদের প্রভু, তুমি আমার প্রভু। আমাকে কার হাতে তুলে দিলে? শত্রুর হাতে, যারা আমাকে তাড়া করছে? নাকি দূরের মানুষের হাতে, যারা আমাকে অবজ্ঞা করছে? যদি তুমি আমার প্রতি রুষ্ট না হও, তবে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। তোমার রহমতই আমার জন্য যথেষ্ট।"

(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪)

এই দোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধৈর্য, বিনয় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতার প্রতীক।
তাইফ থেকে বের হওয়ার পর নবীজি কার্নুল মানাজিল এলাকায় বিশ্রাম নেন। তখন জিবরাইল (আঃ) এসে বলেন:

"আল্লাহ তোমার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। তুমি চাইলে তিনি তাইফের দুই পাহাড়কে একত্র করে তাদের ধ্বংস করে দেবেন।"

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
"না, আমি আশা করি, তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করবে।"
(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩২৩১)

এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া ও ক্ষমাশীলতার সর্বোচ্চ উদাহরণ।

ইসরা ও মেরাজ

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে ইসরা ও মেরাজ একটি অনন্য অলৌকিক ঘটনা। এটি শুধু একটি আধ্যাত্মিক সফর নয়, বরং মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজির মর্যাদা, দায়িত্ব এবং ইবাদতের গুরুত্বের ঘোষণা। এই ঘটনা সংঘটিত হয় নবুয়তের দশম বছরে, যখন নবীজি মক্কায় কঠিন দুঃখ-কষ্টের সময় অতিক্রম করছিলেন। ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। এক রাতে নবীজি মক্কার মসজিদুল হারামে ছিলেন। তখন জিবরাইল (আঃ) এসে তাঁকে একটি বিশেষ বাহন বুরাক-এ আরোহন করান। বুরাক ছিল সাদা রঙের, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট, যার গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। নবীজি বুরাকে চড়ে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছান।
সেখানে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। এটি ছিল নবীজির নেতৃত্বে সকল নবীর ঐক্যের প্রতীক।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন -
“তিনি তাঁর বান্দাকে এক রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন, যার চারপাশ আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার নিদর্শনগুলো দেখাই।”
(— সূরা আল-ইসরা, আয়াত ১)
মেরাজ অর্থ উর্ধ্বগমন। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নবীজি আসমান সফর করেন। জিবরাইল (আঃ)-এর সঙ্গে তিনি একে একে সাত আসমান অতিক্রম করেন।

- প্রথম আসমান: নবীজি সাক্ষাৎ করেন আদম (আঃ)-এর সঙ্গে।
- দ্বিতীয় আসমান: সাক্ষাৎ করেন ঈসা (আঃ) ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সঙ্গে।
- তৃতীয় আসমান: সাক্ষাৎ করেন ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে।
- চতুর্থ আসমান: সাক্ষাৎ করেন ইদ্রিস (আঃ)-এর সঙ্গে।
- পঞ্চম আসমান: সাক্ষাৎ করেন হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে।
- ষষ্ঠ আসমান: সাক্ষাৎ করেন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে।
- সপ্তম আসমান: সাক্ষাৎ করেন ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে, যিনি বায়তুল মাআমুরে হেলান দিয়ে ছিলেন।

প্রতিটি নবী তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর মর্যাদা স্বীকার করেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছান সিদরাতুল মুনতাহা-তে, যা আসমানের সর্বোচ্চ সীমা। সেখানে তিনি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎ ছিল নবীজির জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান।
নামাজ এর ফরজ- এই সফরে আল্লাহ প্রথমে মুসলিমদের জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। নবীজি ফিরে আসার পথে মূসা (আঃ) তাঁকে পরামর্শ দেন—উম্মত এত নামাজ আদায় করতে পারবে না। নবীজি বারবার আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে নামাজের সংখ্যা কমানোর অনুরোধ করেন। অবশেষে তা ৫ ওয়াক্ত নামাজে নির্ধারিত হয়।

(“পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান। আমি যা নির্ধারণ করেছি, তা পরিবর্তন হবে না।”)
(— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬২)
নবীজি মক্কায় ফিরে এসে কুরাইশদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তারা তাঁকে উপহাস করে। কিন্তু নবীজি দৃঢ়ভাবে বলেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অলৌকিক সফর।

আবু বকর (রাঃ) নবীজির কথা শুনে বলেন:
("তিনি যদি বলেন, তবে তা অবশ্যই সত্য।")
(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৬৭৯)

এরপর থেকে তিনি আস-সিদ্দিক উপাধি লাভ করেন।

আকাবার প্রথম বাইয়াত

মক্কায় দীর্ঘ নির্যাতন ও বিরোধিতার পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াতকে মক্কার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। হজের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্র মক্কায় আসত। এই সুযোগে নবীজি তাঁদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। এর ধারাবাহিকতায় মদিনার খাজরাজ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী বছর তাঁরা নবীর সঙ্গে আকাবায় প্রথম বাইয়াত সম্পাদন করেন।

মদিনায় আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে শত্রুতা চলছিল। বু'আথ যুদ্ধ তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটায়। এই পরিস্থিতিতে মদিনার মানুষ শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য নতুন নেতৃত্বের সন্ধান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত তাঁদের কাছে আশার আলো হয়ে আসে।

হজের মৌসুমে মিনার আকাবায় নবীজি মদিনার খাজরাজ গোত্রের ছয়জন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা হলেন:

- আসআদ ইবন যুরারা
- আওফ ইবন হারিস
- রাফে ইবন মালিক
- কুতবা ইবন আমর
- উকবা ইবন আমর
- জাবের ইবন আব্দুল্লাহ

নবীজি তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দেন। তাঁরা তা গ্রহণ করেন এবং মদিনায় ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

পরের বছর (৬২১ খ্রিস্টাব্দে) হজের মৌসুমে মদিনা থেকে আরও ৬ জন যোগ দিয়ে মোট ১২ জন ব্যক্তি মক্কায় আসেন। তাঁরা মিনার আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত সম্পাদন করেন।

তাঁরা শপথ করেন:

1. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।

2. চুরি করবে না।
3. ব্যভিচার করবে না।
4. সন্তান হত্যা করবে না।
5. মিথ্যা বলবে না।
6. সৎকর্মে নবীজির আনুগত্য করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বলেন:
("যদি তোমরা এই শর্তগুলো পূর্ণ কর, তবে জান্নাত তোমাদের জন্য নির্ধারিত। আর যদি কোনো অপরাধ কর, তবে দুনিয়ায় শাস্তি হতে পারে। আর যদি আল্লাহ গোপন রাখেন, তবে তা তাঁর হাতে থাকবে।")
(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৮)
এই বাইয়াতের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাইয়াতের অংশগ্রহণকারীরা মদিনায় ফিরে গিয়ে সক্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে মদিনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়।
মুসাআব ইবনে উমাইয়েরের দাওয়াত কার্যক্রম
মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) ছিলেন মক্কার অন্যতম ধনী পরিবারের সন্তান। তাঁর জীবন ছিল বিলাসিতা ও সৌন্দর্যে ভরপুর। কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত শুনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রথম দাওয়াতকারীদের একজন হয়ে ওঠেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে আল্লাহর পথে নিজেকে নিবেদিত করেন।
আকাবার প্রথম বাইয়াতের পর মদিনার মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেন তাঁদের কাছে একজন শিক্ষক পাঠানোর জন্য, যিনি তাঁদের কুরআন শিক্ষা দেবেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রচার করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে পাঠান মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-কে।

ইবন ইসহাক বলেন:
("রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মুসআব ইবনে উমাইরকে মদিনায় পাঠান, যাতে তিনি তাঁদের কুরআন শিক্ষা দেন এবং ইসলাম প্রচার করেন।"
(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭২)
মুসআব ইবনে উমাইর মদিনায় এসে প্রথমে আসআদ ইবন যুরারার বাড়িতে অবস্থান করেন। আসআদ ছিলেন আকাবার প্রথম বাইয়াতের অন্যতম অংশগ্রহণকারী। তিনি মুসআবকে

সহযোগিতা করেন এবং মদিনার বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। একদিন আসআদ ইবন যুরারা মুসআবকে নিয়ে সা'দ ইবন মু'আয-এর এলাকায় যান। সা'দ তখন মদিনার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। প্রথমে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং মুসআবকে সতর্ক করেন। কিন্তু মুসআব তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। সা'দ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তাঁর গোত্র আওস-কে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করেন। ফলে গোত্রের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

মুসআব ইবনে উমাইর উসাইদ ইবন হুযাইর-এর কাছেও দাওয়াত পৌঁছে দেন। প্রথমে তিনি বিরোধিতা করেন, কিন্তু কুরআনের তিলাওয়াত শুনে তাঁর হৃদয় নরম হয়ে যায় এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসআব ইবনে উমাইরের দাওয়াত কার্যক্রমের ফলে মদিনায় ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় প্রতিটি ঘরে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়। ইবন ইসহাক বলেন:

("মদিনায় এমন কোনো ঘর ছিল না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি।")

(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৫)

আকাবার তৃতীয় বাইয়াত

মক্কায় দাওয়াতের পথ যখন প্রতিকূলতায় ভরা, তখন মদিনা হয়ে ওঠে ইসলামের নতুন আশ্রয়স্থল। আকাবার প্রথম বাইয়াতের পর মদিনায় ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-এর দাওয়াত কার্যক্রমের ফলে মদিনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়। এর ফলে মদিনার মুসলিমরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরও দৃঢ় অঙ্গীকার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে মদিনা থেকে একটি বড় দল মক্কায় আসে এবং মিনার আকাবায় নবীর হাতে দ্বিতীয় বাইয়াত সম্পাদন করে। এটি ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসেবে চিহ্নিত।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে মদিনা থেকে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। নারীরা ছিলেন:

- নুসাইবা বিনতে কা'ব (উম্মে আমারা)
- আসমা বিনতে আমর

পুরুষদের মধ্যে আওস ও খাজরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন।

হজের মৌসুমে মদিনার মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে মিনার আকাবায় সমবেত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আব্বাস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রক্ষা করতেন।

আব্বাস প্রথমে মদিনার লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন:

("মুহাম্মদ আমাদের পরিবারের একজন। আমরা তাঁকে রক্ষা করে আসছি। এখন যদি তোমরা তাঁকে নিয়ে যাও, তবে তোমাদের দায়িত্ব হবে তাঁকে রক্ষা করা। যদি তা করতে না পারো, তবে এখনই সরে যাও।")
(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৬)
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সঙ্গে বাইয়াত সম্পাদন করেন। শর্তগুলো ছিল:

1. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।
2. চুরি করবে না।
3. ব্যভিচার করবে না।
4. সন্তান হত্যা করবে না।
5. মিথ্যা বলবে না।
6. সৎকর্মে নবীজির আনুগত্য করবে।
7. তাঁকে রক্ষা করবে যেমন নিজেদের পরিবারকে রক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
("তোমরা আমাকে রক্ষা করবে যেমন তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানকে রক্ষা কর।")
(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৮)
সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন:
("হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তোমাকে রক্ষা করব। আমাদের জীবনের শপথ, আমরা তোমাকে রক্ষা করব যেমন আমরা আমাদের পরিবারকে রক্ষা করি। যদি আমরা তা না করি, তবে আমাদের জন্য লজ্জা ও অপমান।")
(— ইবন ইসহাক, সীরাতুন্নবী)
এই বাইয়াতের মাধ্যমে মদিনার মুসলমানরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে শুধু নবী হিসেবে নয়, বরং নেতা ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা প্রতিশ্রুতি দেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হিজরত করলে তাকে রক্ষা করবেন। তার পাশে থাকবেন, এবং ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।
হিজরতের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা
আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের পর মদিনার মুসলিমরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্ষা করার অঙ্গীকার করে। এর ফলে মক্কার মুসলিমদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি হয়। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা ইসলামের প্রসার দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের প্রস্তুতি নেন।

কুরাইশরা দারুন নাদওয়ায় গোপন বৈঠক করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, নবীজিকে হত্যা করতে হবে। এজন্য প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচিত করা হয়, যাতে হত্যার দায় কোনো এক গোত্রের ওপর না পড়ে।

আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন:

("আর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল—তোমাকে বন্দী করবে, হত্যা করবে বা বের করে দেবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করছিলেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।")

(— সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৩০)

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেন। মুসলিমরা ধীরে ধীরে মদিনায় চলে যেতে শুরু করেন। মক্কায় তখন কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , আবু বকর (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং কয়েকজন মুসলিম অবশিষ্ট ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি নেন। তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) গোপনে পরিকল্পনা করেন:

- হিজরতের রাতে আলী (রাঃ)-কে নবীজির বিছানায় শোয়ানো হয়, যাতে কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করতে না পারে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) মক্কার দক্ষিণে সুর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন।
- আবু বকর (রাঃ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ রাতে খবর এনে দিতেন।
- তাঁর মেয়ে আসমা (রাঃ) খাবার পৌঁছে দিতেন।
- তাঁর দাস আমির ইবন ফুহাইরা পশুপাল নিয়ে গুহার চারপাশে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে পদচিহ্ন মুছে যায়।

আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন - (আমি নবী মুহাম্মদ সাঃ এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম, এবং আমি তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম। (- সহিঃ মুসলিম হাদিস ২০০৯)

হিজরত ও সওয়ার গুহার ঘটনা

মক্কার কুরাইশরা যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। দারুন নাদওয়ায় বৈঠক করে তারা সিদ্ধান্ত নেয়—প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচিত হবে, যারা একসঙ্গে নবীজিকে হত্যা করবে। এভাবে হত্যার দায় কোনো এক গোত্রের ওপর পড়বে না। হিজরতের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-কে তাঁর

বিছানায় শোয়ান। এতে কুরাইশরা মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ঘরে আছেন। আলী (রাঃ) সাহসিকতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব পালন করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁরা সেখানে তিন রাত অবস্থান করেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ)-কে খুঁজতে বের হয়। তারা গুহার কাছে চলে আসে। আবু বকর (রাঃ) ভীত হয়ে বলেন:

("হে আল্লাহর রাসূল! তারা যদি নিচে তাকায়, তবে আমাদের দেখতে পাবে।")

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

("হে আবু বকর! তুমি কী মনে কর, দুজনের সঙ্গে তৃতীয়জন আল্লাহ থাকলে?")

(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৬৫৩)

এই কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ পায়।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, গুহার প্রবেশপথে একটি মাকড়সা জাল বুনে দেয় এবং একটি কবুতর ডিম পাড়ে। কুরাইশরা দেখে মনে করে, এখানে কেউ প্রবেশ করেনি। এভাবেই আল্লাহ নবীজি ও আবু বকর (রাঃ)-কে রক্ষা করেন।

(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৫)

মদিনায় আগমন ও কুবা মসজিদ

হিজরতের প্রস্তুতি ও সওর গুহায় অবস্থানের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) নিরাপদ পথে মদিনার দিকে যাত্রা করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। মদিনা হয়ে ওঠে ইসলামের কেন্দ্র, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন সেখানে মুসলিমদের জন্য নতুন আশার আলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) মদিনার দক্ষিণে অবস্থিত কুবা গ্রামে পৌঁছান। এটি ছিল মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি ছোট্ট জনপদ। মদিনার মুসলিমরা প্রতিদিন শহরের বাইরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের অপেক্ষায় থাকত।

("মদিনার লোকেরা প্রতিদিন শহরের বাইরে এসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের অপেক্ষায় থাকত। একদিন তাঁরা ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) কুবায় পৌঁছান।")

(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৯)

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনে মদিনার মানুষ আনন্দে উল্লাস করে ওঠে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বাগত জানাতে গান গেয়ে বলেন:

"তালাআল বাদরু আলাইনা, মিন সানিইয়াতিল ওয়াদা'..."

(আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে, ওয়াদা পাহাড়ের দিক থেকে...)

এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনে আনসারদের আনন্দ প্রকাশের প্রতীক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইতিহাসে কুবা মসজিদ নামে পরিচিত।

আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন:

("যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটিই তোমার জন্য অধিক উপযুক্ত।")

(— সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৮)

এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নিজ হাতে এর ভিত্তি স্থাপন করেন। মুসলিমরা একত্র হয়ে নামাজ আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

("যে ব্যক্তি কুবা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে, তার জন্য একটি উমরাহর সমান সওয়াব রয়েছে।")

(— সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস: ১৪১২)

কুবায় কয়েকদিন অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় প্রবেশ করেন। আনসাররা তাঁকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"আমার উটকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর নির্দেশে থামবে।"

উটটি থেমে যায় আবু আইয়ুব আনসারির (রাঃ) বাড়ির সামনে। সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সেখানে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।

(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৯০৬)

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদিনায় হিজরতের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম কাজ ছিল একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। এটি শুধু নামাজের স্থান নয়, বরং মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক এবং ন্যায়বিচারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই মসজিদই ইতিহাসে মসজিদে নববী নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট কাসওয়ার মদিনায় প্রবেশ করে একটি খেজুর শুকানোর চাতালে বসে পড়ে, এটি ছিল সাহল ও সুহায়েল নামক দুই এতিম বালকের জমি। তারা জমিটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে উপহার দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ না করে দশ দিনারে জমিটি ক্রয়

করেন। জমির মূল্য পরিশোধ করেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু - (সিরাত ইবনে হিসাব খন্ড এক পৃষ্ঠা ৪৯৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। সাহাবিরা একত্র হয়ে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ইট ও কাদামাটি দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করেন। ছাদ হিসেবে খেজুর গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নিজেও ইট বহন করেন। সাহাবিরা বলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাজ করব, আপনি বিশ্রাম নিন।"

কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন:

("না, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করব।")

(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৪১)

মসজিদের কাঠামো-

- দেয়াল: কাদামাটি ও ইট দিয়ে তৈরি।
- ছাদ: খেজুর গাছের ডাল ও পাতা।
- মেঝে: মাটির।
- দরজা: তিনটি দরজা ছিল।
- আকার: প্রায় ৫০ মিটার লম্বা ও ৫০ মিটার চওড়া।

ক্বিবলা প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাস, পরে কাবা এবং মসজিদের পাশে নবী কারীম সাঃ এর থাকার জন্য ঘর নির্মিত হয়।

মসজিদে নববী শুধু নামাজের স্থান ছিল না। এটি ছিল:

1. ইবাদতের কেন্দ্র: মুসলিমরা এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত।
2. শিক্ষার কেন্দ্র: এখানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো।
3. রাজনৈতিক কেন্দ্র: রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত এখানেই নেওয়া হতো।
4. সামাজিক কেন্দ্র: মুসলিমদের মিলনস্থল ছিল এই মসজিদ।
5. ন্যায়বিচারের কেন্দ্র: বিরোধ নিষ্পত্তি এখানেই হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী সম্পর্কে দোয়া করেন:

("যে ব্যক্তি আমার মসজিদে নামাজ আদায় করে, তার জন্য অন্য মসজিদে এক হাজার নামাজের সমান সওয়াব রয়েছে, তবে মসজিদুল হারাম ছাড়া।")

(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ১১৯০)

মসজিদের একপাশে নির্মিত হয় আসহাবে সুফফারের জন্য একটি ছাউনি যুক্ত স্থান। দরিদ্র সাহাবীরা অবস্থান করতেন, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে

কুরআন ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতেন এটি ছিল ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র। -(তিরমিজি হাদিস ৩৬৮০)

মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্ব

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর মুসলিম সমাজে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মক্কার মুসলিমরা (মুহাজির) সবকিছু ছেড়ে মদিনায় চলে আসেন। তাঁদের অনেকেই নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অন্যদিকে মদিনার মুসলিমরা (আনসার) তাঁদের স্বাগত জানান। কিন্তু শুধু আতিথেয়তা যথেষ্ট ছিল না; প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন। তাই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণের পরপরই আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়িতে এক সভা আহবান করেন। সেখানে তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। মোট ৯০ জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন মুহাজীর ও ৪৫ জন আনসার। প্রতিটি মহাজীর সাহাবীকে একজন আনসার ভাইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তারা একে অপরের সম্পদ, ঘর, খাদ্য ও হৃদয় ভাব করে নেন। কেউ কেউ তাদের উত্তরাধিকার পর্যন্ত নির্ধারণ করে ফেলেন, যদিও পড়ে তার কেবল রক্ত সম্পর্কে ওদের জন্য নির্ধারিত হয়।
আল্লাহ বলেন:
(“আত্মীয়রা আল্লাহর বিধান অনুসারে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিক হকদার।”)
(— সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৬)
সাদ ইবনে রাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন তার মুহাজির ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে -(আমি দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার করি তুমি চাইলে একজনকে তালাক দিয়ে দেই তুমি তাকে বিবাহ করতে পারো আমার সম্পদ দুইভাগ করি এক ভাগ তোমার) _(সহীহ বুখারী হাদিস ৩৭৮৪)
আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনয়ের সঙ্গে বলেন -(আল্লাহ পরিবার ও সম্পদে বরকত দিন আমাকে শুধু বাজার দেখিয়ে দাও।) _(সহীহ বুখারী হাদিস ৩৭৮৫)

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٩

(আর এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আসার আগে থেকেই (মাদীনাহ) নগরীর বাসিন্দা ছিল আর ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের কাছে হিজরাত করে এসেছে। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোন কামনা রাখে না, আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়- নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত: যাদেরকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।

মদিনা সনদ ও রাষ্ট্র ঘটন

মদিনায় হিজরতের পর মুসলিম সমাজ একটি নতুন বাস্তবতায় প্রবেশ করে। মক্কার মুসলিমরা (মুহাজির) নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় আসেন, আর মদিনার মুসলিমরা (আনসার) তাঁদের স্বাগত জানান। কিন্তু মদিনায় শুধু মুসলিমরা ছিল না; সেখানে ইহুদি গোত্র, মুশরিক আরব গোত্রও বসবাস করত। তাই প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তি, যা সবাইকে একত্র করবে এবং শান্তি বজায় রাখবে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রেক্ষাপটে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে মুসলিম, ইহুদি ও মুশরিক গোত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর ফলেই একটি লিখিত চুক্তি তৈরি হয়, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।

ইবন ইসহাক বলেন:

(“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি করেন। এতে তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।”)

(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৫)

মদিনা সনদে প্রায় ৪৭টি ধারা ছিল। এর মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো হলো:

- মুসলিমদের ঐক্য: মুহাজির ও আনসাররা এক উম্মত হিসেবে গণ্য হবে।
- ধর্মীয় স্বাধীনতা: ইহুদিরা তাঁদের ধর্ম পালন করতে স্বাধীন থাকবে।
- পারস্পরিক সহযোগিতা: সবাই একে অপরকে রক্ষা করবে এবং অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে একত্র হবে।
- ন্যায়বিচার: কোনো অপরাধ হলে তা ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাধান হবে।
- যুদ্ধনীতি: বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে সবাই একত্র হয়ে লড়বে।
- নবীজির নেতৃত্ব: নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা ও বিচারক।

প্রশাসনিক কাঠামো - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। মসজিদে নববী ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। বিচার, শিক্ষা, যুদ্ধনীতি—সব সিদ্ধান্ত এখানেই নেওয়া হতো।
সামাজিক কাঠামো - মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়। ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি করে শান্তি বজায় রাখা হয়। মুশরিক গোত্রদেরও সনদের আওতায় আনা হয়।
অর্থনৈতিক কাঠামো - মুহাজিরদের পুনর্বাসন করা হয়। আনসাররা তাঁদের সম্পদ ভাগ করে দেন। বাজার ও বাণিজ্য ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব-
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ছিলেন শুধু ধর্মীয় নেতা নন, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
("মুসলিমরা একে অপরের ভাই। তারা একে অপরের রক্তের সমান।")
(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৪৪২)
বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট
ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক মূল পরিবর্তনের ঘটনা। এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ, যা শুধু একটি সাময়িক সংঘর্ষ নয়। বরং ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ন্যায় সংঘতো প্রতিরোধের প্রত। বদর যুদ্ধ এর প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে হিজরতের পর মদিনা মুসলিম অবস্থান শত্রুতা এবং ইসলামের আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হয়।
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সাহাবীরা মক্কার থেকে মদিনায় হিজরত করেন ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। তারা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে চেষ্টা করেন। কিন্তু কুরাইশারা হিজরতের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। তারা মুসলমানদের সম্পদ দখল করে, কাফেলা আক্রমণের পরিকল্পনা করে এবং মদিনায় হামলার হুমকি দেয়। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশদের একটি বিশাল বাণিজ্য কাফেলা, যা নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান, সিরিয়া থেকে মক্কার পথে ফিরছিল। নবী করিম সাঃ মুসলমানদের সম্পদ পুনরুদ্ধার ও কুরাইশদের অর্থনৈতিক ক্ষতি দুর্বল করার উদ্দেশ্যে কাফেলাটি বাধা গ্রস্থ করার পরিকল্পনা করেন। এটি ছিল আত্মরক্ষা মূলক ও ন্যায় সঙ্গত প্রতিক্রিয়া। আবু সুফিয়ান কাফেলাকে রক্ষা করতে কুরাইশদের কাছে সাহায্য চায়। কুরাইশরা প্রায় এক হাজার সৈন্যসহ বদরের দিকে অগ্রসর হয়। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কুরাইশে কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের

শক্রুদের মুখোমুখি করিয়ে দেন) -(সহীহ বুখারীর হাদিস ৩৬৬৬) এই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে বদর যুদ্ধ ছিল পূর্ব পরিকল্পিত যুদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত একটি ঐশী পরীক্ষা।

বদর যুদ্ধ ফলাফল ও রাজনৈতিক প্রভাব

ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ এক অনন্য মাইলফলক। এটি ছিল প্রথম বৃহৎ সংঘর্ষ, যেখানে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারিত হয়। ২ হিজরির ১৭ রমজান (১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) বদরের মরুভূমিতে সংঘটিত এই যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে নতুন শক্তি ও মর্যাদা প্রদান করে। কুরআনে এ দিনকে বলা হয়েছে "ইয়াওমুল ফুরকান"—সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বিভাজনের দিন।

মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাঁদের কাছে সীমিত অস্ত্র, দুটি ঘোড়া ও কয়েকটি উট ছিল। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নেতৃত্ব দেন। তিনি বদর প্রান্তরে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন:

("হে আল্লাহ! যদি আজ এই দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে পৃথিবীতে তোমাকে ইবাদত করার কেউ থাকবে না।")

(— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৭৭৫) অন্য দিকে কুরাইশদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ জন। তাঁদের কাছে ১০০ ঘোড়া ও ৬০০ বর্ম ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন আবু জাহল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা।

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয় তিন বনাম তিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ দিয়ে। মুসলিমদের পক্ষ থেকে বের হন হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামজা (রাঃ) ও হযরত উবাইদাহ ইবন হারিস (রাঃ)। কুরাইশদের পক্ষ থেকে বের হন উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ। মুসলিমরা বিজয় অর্জন করেন। এরপর দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জন করেন। ফেরেশতারা মুসলিমদের সাহায্য করেন।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

("যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের সাহায্য করেছিলেন এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা।")

(— সূরা আনফাল, আয়াত ৯)

মুসলিমদের বিজয় -মুসলিমরা ৭০ জন কুরাইশকে হত্যা করে এবং ৭০ জনকে বন্দী করে। মুসলিমদের শহীদ হন প্রায় ১৪ জন।

- বদর যুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে মদিনায় মোহাম্মদ সাঃ এর নেতৃত্বে আরো সংহত হয়।
- ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- মদিনার বিভিন্ন গোত্র ইসলামকে সমর্থন করতে শুরু করে।

কুরাইশদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। কুরাইশরা মুসলমানদের ছোট ও দুর্বল ভাবতো বদরের পর তারা বুঝতে পারে, ইসলাম একটি অপরাজয়ের আদর্শ। তারা প্রতিশোধের পরিকল্পনা শুরু করে যা পরবর্তী ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের দিকে গড়ায়। আশেপাশের গোত্র ও অঞ্চল ইসলামকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি ও সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদর যুদ্ধ ছিল ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের সাহায্য মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -(জিব্রাইল আলাই সালাম আমার ডান পাশে মিকাইল আলাইহি সালাম বাম পাশে এবং ইসরাফিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে যুদ্ধ করেছিলেন।)(- মুসনাত আহমদ হাদিস ১৪৪৪)

যুদ্ধবন্দীদের আচরণ ও নীতিমালা

ইতিহাসের যুদ্ধ মানেই ছিল বন্‌্দিদের প্রতি নির্মমতা, নির্যাতনও হত্যার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ইসলাম এই প্রচলিত রীতিকে পাল্টে দেয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে আচরণ প্রদর্শন করেছেন, তা ছিল করুণা, ন্যায় ও সভ্যতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বদর যুদ্ধের পর বন্‌্দিদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ ছিল এতটাই মানবিক যে, তা শত্রুদের হৃদয় ও ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে।

● মুক্তিপণ ব্যবস্থা- যারা মুক্তিপণ দিতে সক্ষম ছিল, তারা অর্থ বা সম্পদ দিয়ে মুক্তি লাভ করে। এটি ছিল বন্দীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক আচরণের নিদর্শন।

● শিক্ষা দিয়ে মুক্তি- যারা মুক্তিপণ দিতে সক্ষম ছিল না, তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতরা মুসলিম শিশুদের শিক্ষা দিয়ে মুক্তি লাভ করে। এভাবে বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে সমাজে জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটে।

(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩১৩১)

● খাদ্য ও আশ্রয়-ইতিহাসে উল্লেখ আছে, মুসলিমরা বন্দীদের নিজেদের মতোই খাদ্য ও আশ্রয় দেন। তাঁরা বন্দীদের জন্য ভালো খাবার রেখে নিজেরা সাধারণ খেজুর খেয়ে থাকতেন।

(— ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

- আবু বকর (রাঃ) প্রস্তাব দেন—বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেওয়া হোক।
- উমর (রাঃ) প্রস্তাব দেন—তাঁদের হত্যা করা হোক, কারণ তাঁরা ইসলামের শত্রু।

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের মত গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ ব্যবস্থা চালু করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

(“তোমরা বন্দীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো।”)

(— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৭৭৫)

ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ
فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٤

অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না।) (- সূরা মুহাম্মদ আয়াত ৪)

এই আয়াত বন্দীদের প্রতি ইসলামের নীতিমালা স্পষ্ট করে দেয়—দয়া অথবা মুক্তি।

বদর যুদ্ধে শহীদ ও বীর সাহাবীদের স্মরণ

ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক বিজয়, যা শুধু সাময়িক সাফল্য নয়, বরং ঈমান, আত্মত্যাগ ও আল্লাহর সাহায্য এক জীবন তো দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রহরী, যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করে সত্যের পতাকা উত্তীর্ণ রাখেন। তাদের স্মরণ শুধু ইতিহাস নয়, বরং তা ঈমানের শক্তি ও আদর্শের অনুপ্রেরণা।

বদর যুদ্ধের ১৪ জন সাহাবী শহীদ হন ৬ জন মুজাহির ৮ জন আনসার। তাদের কবরস্থ করা হয় বদরের প্রান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাদের জন্য দুয়া করেন এবং বলেন। - (আল্লাহর কাছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, বদরের শহীদরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।) (মাসনাদ আহমদ হাদিস ১৩৫৪)

হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের একক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উতবা ইবনে রাবিয়াকে পরাজিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (আসাদুল্লাহ) আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন।

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একক যুদ্ধে ওয়ালিদকে পরাজিত করেন। তরুণ বয়সেই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তার জন্য দোয়া করেন, আর বলেন। আল্লাহ তোমার তরবারিকে বরকত দান করুন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের কৌশল ও সাহসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বন্দিদের বিষয়ে পরামর্শ দেন, যা কুরআনে আলোচিত হয়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧

কোন নাবীর জন্য এটা সঠিক কাজ নয় যে, দেশে (আল্লাহর দুশমনদেরকে) পুরোমাত্রায় পরাভূত না করা পর্যন্ত তার (হাতে) যুদ্ধ-বন্দী থাকবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও আর আল্লাহ চান আখিরাত (এর সাফল্য), আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী।

(— সূরা আল আনফাল আয়াত ৬৭)

لَّوْلَا كِتَـٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨

আল্লাহর লেখন যদি পূর্বেই লেখা না হত তাহলে তোমরা যা (মুক্তিপণ হিসেবে) গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি পতিত হত।

— (সূরা আল আনফাল আয়াত ৬৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বদরের শহীদদের কবর জিয়ারত করেন, এবং তাদের জন্য দোয়া করেন। - (তোমরা আল্লাহর পথে প্রাণ দিয়েছো তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।) (সুনান আন মাসায়ী হাদিস - ২০৭৭)

বদরের শহীদদের স্মরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বারবার বলেন তারা আমার সহচর্যে ছিলেন, তাদের মর্যাদা অপরিসীম।

বনু কাইনুকা ইহুদিদের সঙ্গে বিরোধ ও বহিষ্কার

মদিনায় হিজরতের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মুসলমানদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে স্থানীয় ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গে একটি রাজনৈতিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মিছাকে মদিনা নামে পরিচিত। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল সব পক্ষ মদিনার শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষা করবে, এবং কেউ কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না। কিন্তু বনুকাইনুকা গোত্র এই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্বেষ ও অপমানজন আচরণ শুরু করে। ইতিহাস বিদ্যের মতে, বিরোধের সূচনা হয় একটি মুসলিম নারীর মানহানির ঘটনা থেকে। বনু কাইনুকা এক স্বর্নকার তার দোকানে আসা এক মুসলিম নারীর পোশাক পেরেকের সঙ্গে আটকে দেন, ফলে তিনি প্রকাশ্যে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। একজন মুসলিম যুবক এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে স্বর্নকারকে হত্যা করেন। উত্তরে ইহুদিরা সেই

যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ঘটনার মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়।

(যখন বনু কাইনুকা এক মুসলিম নারীর সঙ্গে অপমানজন আচরণ করে। তখন নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা নেন।- ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবি)

- বনু কাইনুকা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করতে থাকে।
- তারা বলত- তোমরা বদরে কিছু কুরাইশকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে পারবে না।
- নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে দুর্গ অবরোধ করেন।
- অবরোধ চলে ১৫ দিন, শেষে তারা আত্মারসমর্পন করে।

(নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কাইনুকা দুর্গ অবরোধ করেন এবং তারা আত্মাসমর্পন করে। - (সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৩০০৪)

- নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে গোত্রের সদস্যদের শাস্তি দিতে চাইলেন।
- আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফেকি নেতা) তার গোত্রীয় সম্পর্কের কারনে সুপারিশ করেন।
- নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন, হত্যা নয়।
- গোত্রটি সিরিয়ার দিকে চলে যায়, তাদের সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে।

(রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কাইনুকাকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন, তাদের হত্যা করেননি। - মুসনাদ আহমদ হাদিস ২৩৪৫)

- এই বহিষ্কার ছিল চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া।
- মুসলমানদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।
- অন্যান্য ইহুদি গোত্র সতর্ক হয়ে যায়, যদিও পরবর্তীতে বনি নাযির ও বনু কিরাইজা একই পথ অনুসরন করে।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٨

আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তাহলে (তাদের চুক্তিকে) তাদের প্রতি নিক্ষেপ কর যাতে সমান সমান অবস্থা বিরাজিত হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই (ওয়াদা-চুক্তি-প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

—(সূরা আল আনফাল আয়াত ৫৮)

সারিয়াগুলো ও ছোট ছোট অভিযান

হিজরতের প্রথম বর্ষ , নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে সদ্য গৃহীত মোহাজিরদের পূর্ণবাসনের ব্যস্ত, কিন্তু মক্কার কুরাইশরা তখনও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলো সিরিয়া ও মক্কার মধ্যেবর্তি পথে অবাধে চলাফেরা করছিল, যা নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ছিল এক সুস্পষ্ট হুমকি। এই প্রেক্ষাপটে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার কৌশল হিসেবে প্রথমবারের মতো একটি ছাড়িয়া দল প্রেরণ করেন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন চাচা, সাহস ও বীরত্তের অনন্য হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তার নেতৃত্ব ৩০ জন মুহাজির সাহাবী মদিনা থেকে রওনা হন। তাদের গন্তব্য ছিল সীফুল বাহর- লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল, যেখানে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার পথে ফিরছিল, কাফেলাটির নেতৃত্বে ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবু জাহল, যার সঙ্গে ছিল প্রায় ৩০০ জন সশস্ত্র কুরাইশ সৈন্য।

দুই পক্ষ মুখোমুখি হয়। উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয়। মাইজদী ইবনে ওমর আল জুহানি নামক এক নিরপেক্ষ গোত্রপ্রতি দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ সুগম করেন। ফলে যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে। এই অভিযানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি সাময়িক পতাকা উত্তোলন করা হয়। মোহাম্মদ সাঃ নিজ হাতে একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করেন, এবং তা প্রদান করেন হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পতাকাটি বহন করেন সাহাবী আবু মারসাদ আল গানাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই পতাকা ছিল মুসলিমবাহিনীর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রতীক।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম প্রথম যে পতাকা উত্তোলন করেন তা ছিল হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বধীন অভিযানে। - ইবনে সাদ তাবাকাতুল কুবরা খন্ড দুই পৃষ্ঠা ৬)

(এই অভিযান সংঘটিত হয় সীফুল বাহরে, যেখানে মুসলিম বাহিনী ও কুরাইশ কাফেলা মুখোমুখি হয়। কিন্তু মাজদু ইবনে আমর এর মধ্যস্থতায় যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়।) - (সিরাতুন্নবী খন্ড এক পৃষ্ঠা ৫৮৭- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির খন্ড তিন পৃষ্ঠা ২২৪)

ওহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষের সংঘটিত বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম বিজয়। এতে কুরাইশদের বহুনেতা নিহত হয় - উতবা সায়েবা আবু জাহল সহ প্রায় ৭০ জন। এই পরাজয় মক্কার মুশরিকদের জন্য ছিল অপমানজনক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বলতার প্রকাশের কারণ। তারা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল, কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেয় মদিনায় আক্রমণ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ইসলামি রাষ্ট্র কে ধ্বংস করতে হবে।
মক্কার কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্য, ২০০ টি ঘোড়া, ৭০০ বর্মধারী, এবং ৩০০০ উট নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। তাদের সঙ্গে ছিল ১৪ জন নারী, যারা যুদ্ধের ময়দানে কবিতা ও গান গেয়ে সৈন্যদের উজ্জীবিত করতো। হিন্দ বিনতে উতবা ছিলেন নারীদর দলের নেতৃত্বে । (-ইবনে হিশাম সিরাত খন্ড ২ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসির)
নবী কারীম সাঃ যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে ৭০০ সাহাবী কে নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ৫০ জন তীরন্দাজ, যাদের পাহাড়ে অবস্থান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রথমে মদিনার ভিতরে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। অতঃপর মোহাম্মদ সাঃ সাহাবীদের মত গ্রহণ করে ওহুদ পর্বতের পাদদেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। (-সহি বুখারি হাদিস ৪০৪৩)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন (-উহুদ পাহাড় আমাদের ভালবাসে আমরা তাকে ভালোবাসি) (-সহীহ বুখারি হাদিস ১৪৮১)
ওহুদ যুদ্ধ ছিল কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মদিনার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এবং প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার দেয়াল হিসেবে কাজ করে।
উহ যুদ্ধের কারণ ও ব্যাখ্যা: -

- বদরের প্রতিশোধ- কুরাইশদের পরাজয়ের অপমান ঘোচাণা।
- রাষ্ট্রীয় ধ্বংসের প্রয়াস - নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নেতৃত্বে ঘরে ওঠা ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা।
- রাজনৈতিক পূর্ণগঠন- কুরাইশদের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
- আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার - মুসলিমদের মনোবল ভেঙে দেওয়া।

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

৩ হিজরীর ৭ শাওয়াল (২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে) শনিবার সকালে মুসলিম বাহিনী উহুদ পর্বতের পাদদেশে অবস্থান নেয়, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ৫০ জন তীরন্দাজকে একটি পাহাড়ে মোতায়েন করেন এবং নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আমাদের বিজয় দেখো তবুও তোমরা পাহাড় ছেড়ে নামবে না। যুদ্ধের প্রথম ধাপ- মুসলিমদের বিজয় : যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুসলিমরা প্রায় বিজয় অর্জন করে।

কৌশলগত ভুল পাহাড় ছেড়ে যাওয়া - তীরন্দাজদের একটি দল মনে করে যুদ্ধ শেষ বিজয় নিশ্চিত। তারা গনিমতের লোভে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, কুরাইশ বাহিনী নিয়ে পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেন। (ইবনে হাসান সীরাত খন্ড দুই পৃষ্ঠা ৫৮৯)

যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন - আচমকা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মনে করে কুরাইশরা আনন্দ প্রকাশ করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আক্রমণ হয়। তিনি আহত হন, তার মুখে রক্ত, দাঁত ভেঙে যায়, এবং মাথায় আঘাত পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যুদ্ধ শেষে আহত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করো তারা জানে না। (-সহিহ মুসলিম হাদিস ১৭২৯)

উহুদ যুদ্ধের শহীদদের স্মরণ

ওহুদ যুদ্ধের শহীদরা ছিলেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ। তাদের আত্মত্যাগের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন। -

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ভেব না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(— সূরা আল ইমরান আয়াত ১৬৯)

এই আয়াত ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য অবতীর্ণ হয় যা তাদের জান্নাতে জীবন্ত অবস্থার প্রমাণ দেয়।

উহুদ যুদ্ধের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নিয়মিতভাবে শহীদদের কবর জিয়ারত করতেন। তিনি তাদের জন্য দুয়া করতেন এবং বলতেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরা শহীদ।

(হে শহীদগণ তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিত আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। মুসনাত আহমদ হাদিস ১৩৫৪৪)

হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ওহুদ যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা, তার শাহাদাতের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এতটাই শোকাহত হন যে, তার লাশের বিকৃতি দেখে বলেন। - হে হামজা! আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন তুমি ছিলে সদাচারী, আত্মত্যাগী ও আল্লাহর পথে অটল। -(ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী খন্ড দুই)

উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন ৭০ জন সাহাবী, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাদ ইবনে রাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনসার ইবনে নাজর রাদিয়াল্লাহু আনহু, নবী করিম সাঃ তাদের দাফন করেন ওহুদ প্রান্তরে, পৃথক কবর না দিয়ে দুইজন করে একত্রে দাফন করেন এবং যার কুরআন বেশি ছিল তাকে আগে রাখা হতো।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত :-(জান্নাতে প্রবেশকারী কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসতে চায় না যদিও তাকে দুনিয়ায় সব কিছু দেওয়া হয়। কিন্তু শহীদ ব্যতীত সে চাইবে যেন তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং দশবার শহীদ করা হয় কারণ সে শহীদের মর্যাদা দেখে। -সহীহ বুখারি হাদিস ২৮১৭-সহীহ মুসলিম হাদিস ১৮৭৭)

উহুদের পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

উহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানরা সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। মক্কার কুরাইশরা মদিনা দখল করতে না পারলেও, মুসলিমদের মনোবলে চির ধরাতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধের পর মুনাফিকদের সাহস বেড়ে যায়, এবং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করে। (তোমরা কি মনে কর জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদ করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের পরীক্ষা করেননি করেননি - (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৪২) এই আয়াত উহুদের পর অবতীর্ণ হয় যা মুসলিমদের আত্মসমীক্ষার আহ্বান জানায়।

উহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর নেতৃত্বে ৩ শতাধিক মুনাফিক যুদ্ধের পূর্বে বাহিনী থেকে ফিরে যায়। এটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিশ্বাস ধাতবতার প্রমাণ। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের মিথ্যাচার ও দিমু কি চরিত্রকে প্রকাশ করে।

ওহুদ যুদ্ধ মুসলিম সমাজে আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য ও অনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর আনুগত্যের শিক্ষা দেয়, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় ছেড়ে নেমে এসেছিল, তারা গভীর অনুশোচনায় নিমজ্জিত

হয়। নবী করীম সাঃ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা আসে। -

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ مِنكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُواْ ۖ وَلَقَدۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٥

দু'দল পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের মধ্যে যারা পলায়নপর হয়েছিল, তোমাদের কোন কোন অতীত কার্যকলাপের জন্য শয়ত্বান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, অতি সহনশীল।

— (সুরা আল ইমরান আয়াত ১৫৫)

উহুদ যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে নবী করীম সাঃ নিয়মিত কবর জিয়ারত করতেন। তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন, এবং মুসলিম সমাজে তাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এই স্মরণ মুসলিম সমাজের ঈমান, সাহসিকতা ও ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে। উহুদের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারিয়া ও গোয়েন্দা অভিযান বাড়িয়ে দেন। তিনি মদিনার চারপাশে গোত্রগুলোর কি করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে পুনঃগঠিত করেন, এটি ছিল রাষ্ট্রীয় পূর্ণ ঘটনের সূচনা - (আর রাহীকুল মাখতুম)

রাজি ট্রাজিডি ঘটনা

হিজরতের চতুর্থ বর্ষ, মহরম মাস হুদায়েল গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের অভিনয় করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অনুরোধ করে, যেন তাদের এলাকায় দ্বীনি শিক্ষা দিতে কিছু শিক্ষক পাঠানো হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাদের অনুরোধে এ ১০ জন সাহাবীকে পাঠান। যারা ছিলেন কুরআনের শিক্ষক, দায়ী এবং দিনের প্রচারক। -(ইবনে হিশাম সিরাত খন্ড ২- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসির)

এই অনুরোধ ছিল একটি কাপুরুষোচিত ফাঁদ। উদাল ও আল - কারা নামক দুটি গোত্রকে অর্থ দিয়ে প্ররোচিত করা হয়, যাতে তারা মুসলিম শিক্ষকদের হত্যা করে। সাহাবীরা রাজি নামক স্থানে পৌঁছালে হঠাৎ করে চারদিক থেকে আক্রমণ হয়। সাতজন সাহাবী শহীদ হন। বাকিদের বন্দি করা হয়। -(সুনান আবু দাউদ হাদিস ২৬৬৫)

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মক্কায় বন্দি করে উকবা ইবনে হারিস এর নেতৃত্বে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে তিনি বলেন- হে আল্লাহ! আমার রসূলকে জানিয়ে দাও তার পথে শহীদ হচ্ছি -(সহীহ বুখারী হাদিস ৩০৪৫)

দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন যা শহীদদের শেষ ইবাদতের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনার সংবাদ শুনে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং বলেন - তোমরা আমার সাহাবীদের হত্যা করেছ যারা তোমাদের কাছে দিন শেখাতে

গিয়েছিল।-(মুসনাত আহমদ হাদিস ১৫৫৭৮) তিনি তাদের জন্য দুয়া করেন এবং শহীদদের আত্মত্যাগের কথা সাহাবীদের স্মরণ করিয়ে দেন।

বীর মাওনার ট্রাজেডি

হিজরতের চতুর্থ বর্ষ। ইসলামের দাওয়াত তখন আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নাজত অঞ্চলের আমির আবু বারা আমির ইবনে মালিক অনুরোধ করেন, যেন তিনি কিছু সাহাবীকে পাঠান, যারা স্থানীয়দের কুরআন শিক্ষা এবং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রথমে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, কারণ নাজরের লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতকতায় কুখ্যাত কিন্তু আবু বারা তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ৭০ জন কুরআনের হাফেজ, দাই ও শিক্ষক সাহাবীকে পাঠান। তারা ছিলেন ক্বাইযুন নামে পরিচিত - যারা কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং রাতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

সাহাবীরা বীর মাওনা নামক স্থানে পৌঁছালে আমির ইবনে তোফায়েল, যিনি আবু বারার ভ্রাতুষ্পুত্র, তার গুত্র ও মিত্র গোত্রগুলোকে উস্কে দেন। একত্রিত হয়ে তারা সাহাবীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ৬৯ জন সাহাবী শহীদ হন, মাত্র একজন কাব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত অবস্থায় বেঁচে যান। এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পেয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই শোকাহত হন যে তিনি একমাস ধরে ফজরের নামাজে কুনুত নাজিলা পাঠ করেন এবং হত্যাকারী গোত্রেগুলুর বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেন। -(তিনি একমাস ধরে ফজরের নামাজে কুনুত পাট করতেন এবং যাকওয়ান ও লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতেন- (সহীহ বুখারি হাদিস৪০৯০ সহীহ মুসলিম হাদিস ৬৭৭) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন। - (তোমাদের শহীদদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা রাখেন বীর মাওনার শহীদগণ) -(মুসনাদ আহমদ হাদিস ১৫৫৭৮)

তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ আসে। কোরআনের একটি আয়াত ও নাযিল হয়,যা পরে মাকসূর (অবলুপ্ত) হয়ে যায়, কিন্তু সাহাবীরা তা স্মরণ রাখতেন।, -(আমাদের জাতির পক্ষ থেকে আমাদের রব কে জানিয়ে দাও আমরা রসূলের বাণী পৌঁছে দিয়েছি আমাদের হত্যা করা হয়েছে) (-সহীহ বুখারি হাদিস ৪০৯১)

বনু নাজিরের ষড়যন্ত্র ও বহিষ্কার

উহুদ যুদ্ধের পর মদিনার ইহুদি গোত্রগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বনু নাজির ছিল মদিনার একটি প্রভাবশালী ইহুদি গোত্র। তারা ছিল ধনী কৃষি কাজে পারদর্শী।

যারা শুরুতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু উহুদের পর তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। তারা মুনাফিক দের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বনু নাজিরের এলাকায় আমির ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনার জন্য যান। তারা সম্মত হয় কিন্তু গোপনে পরিকল্পনা করে উপর থেকে পাথর ফেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে হত্যা করা হবে। আমর ইবনে জোহাস নামে একজন দায়িত্ব নেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান, এবং মদিনায় ফিরে আসেন। - (সুনানে আবু দাউদ হাদিস ৩০০৪)

এই ষড়যন্ত্র ছিল চুক্তিভঙ্গের প্রকাশ্য উদাহরণ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ১০ দিনের মধ্যে মদিনা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। বনু নাজির গোত্র প্রথমে রাজি হয়, কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের উস্কে দেন - যেন তারা যুদ্ধ করে। তারা প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে এবং অবরোধ করে। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে, এবং খায়বারের দিকে নির্বাসিত হয়। তাদের অস্ত্র ও সম্পদ মুসলিমদের গনিমত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। -(সহি বুখারি হাদিস ২০৩৭)

এই ঘটনার পর মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন -

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ ٢

কিতাবধারীদের অন্তর্ভুক্ত কাফিরদেরকে আক্রমণের প্রথম ধাপেই তিনিই তাদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলেন। তোমরা ধারণাও করনি যে, তারা বের হবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ ('র কবল) থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমন দিক থেকে পাকড়াও করলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। তারা তাদের নিজেদের হাত দিয়েই নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করল, আর মু'মিনদের হাতেও (ধ্বংস করাল)। অতএব হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

— (সূরা হাশর আয়াত ২)

খন্দকের (আহজাব) যুদ্ধ

৫ হিজরির শাওয়াল মাসে (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশ, ইহুদি গোত্র এবং অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত আক্রমণ ঘটে। প্রায় ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে তারা

মদিনা অবরোধ করে। মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০ জন। এই অসম যুদ্ধ ইতিহাসে "খন্দক যুদ্ধ" বা "আহযাব যুদ্ধ" নামে পরিচিত।

- বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলছিল।
- মদিনার ইহুদি গোত্র বানু নাদীর মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে এবং কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দেয়।
- বিভিন্ন আরব গোত্রকে একত্রিত করে মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়।
- এভাবে প্রায় ১০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ বলেন:

("যখন তারা তোমাদের ওপর চারদিক থেকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমাদের চোখ ভীত হয়ে গিয়েছিল, তখন তোমরা আল্লাহর প্রতি সন্দেহে পড়ে গিয়েছিলে।")

(— সূরা আল-আহযাব, আয়াত ১০)

খন্দক খনন -নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। হযরত সালমান ফারসি (রাঃ) প্রস্তাব দেন—মদিনার চারপাশে খন্দক খনন করা হোক। এটি ছিল পারস্যের যুদ্ধকৌশল, আরবদের কাছে অজানা।

- মুসলিমরা মদিনার দুর্বল দিকগুলোতে খন্দক খনন করেন।
- নবীজি নিজেও খন্দক খননে অংশগ্রহণ করেন।
- সাহাবিরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাজ করেন। তাঁদের পেটে পাথর বাঁধা ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে মাটি কাটেন এবং সাহাবিদের সঙ্গে কাজ করেন।

(— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪১০০)

- কুরাইশ ও মিত্ররা মদিনার চারপাশে এসে খন্দকের কারণে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়।
- তারা প্রায় এক মাস মদিনা অবরোধ করে রাখে।
- মুসলিমরা খন্দকের ভেতরে অবস্থান করে প্রতিরোধ চালান।

কুরাইশদের বিখ্যাত যোদ্ধা আমর ইবন আবদে ওয়ুদ খন্দক পার হয়ে মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ করেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করেন।

(— সুনান নাসায়ী, হাদীস: ৩১৪১)

দীর্ঘ অবরোধের পর আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করেন। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও ঠান্ডা বাতাস শত্রুদের শিবিরে আঘাত হানে। তাঁরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

("আমি তাদের বিরুদ্ধে বাতাস ও এমন বাহিনী পাঠিয়েছিলাম, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।")

(— সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৯)

যুদ্ধের ফলাফল -

- মুসলিমরা বিজয় অর্জন করেন, যদিও তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন।
- কুরাইশ ও মিত্ররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।
- বানু কুরাইযা গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায়। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

বনু কুরাইযা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান ও বিচারের ঘটনা

খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যখন বহিরাগত আক্রমণের মুখে অবরুদ্ধ, তখন মদিনার অভ্যন্তরে একটি ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে। ইহুদি গোত্র বনু করাইযা যারা মদিনা সনদের আওতায় মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। তারা সেই যুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়। এই ঘটনা মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে চরমভাবে হুমকির মুখে ফেলে। যুদ্ধ শেষে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। বনু কুরাইযা ছিল মদিনার দক্ষিণাঞ্চলের বসবাসকারী একটি ইহুদি গোত্র। তারা মদিনা সনদের আওতায় মুসলমানদের সঙ্গে পারস্পরিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। -(ইবনে হিশাম সিরাত গ্রন্থ- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসীর)

খন্দকের যুদ্ধ চলাকালে বনু কুরাইযা গোত্র কুরাইশ ও বনু গাতাফান গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা মুসলমানদের পেছন থেকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে চুক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তারা চুক্তি অস্বীকার করে। - (তারা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের পেছন থেকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল। - (সহিহ বুখারি হাদিস ৩০৪৩)

খন্দকের যুদ্ধ শেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে বনু কুরাইযার দুর্গ অবরোধ করেছেন। অবরোধ চলে ২৫ দিন অবশেষে বনু কুরাইযা আত্মসমর্পণ করে । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারের দায়িত্ব দেন সাদ ইবনে মুয়াজ রঃ কে যিনি ছিলেন বনু আতস গোত্রের নেতা এবং বনু কুরাইযার পূর্ব পরিচিত। তিনি বলেন আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করব। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রায় অনুযায়ী - যারা যুদ্ধ করেছে তাদের মৃত্যুর দন্ড, নারীদের বন্দিত্ব, সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন।

পরবর্তী দাওয়াতী কার্যক্রম

খন্দক যুদ্ধের বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত আরো দৃঢ় হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন - ইসলামের বার্তা শুধু মদিনায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে

না। তাই তিনি শুরু করেন আন্তর্জাতিক ও আন্তঃগোত্রীয় দাওয়াতি কার্যক্রম, যা ছিল শান্তি, ন্যায় ও আল্লাহর পথে আহ্বানের এক মহা পরিকল্পনা ।

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٢٥

জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান জানাও আর লোকেদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গুমরাহ হয়ে গেছে। আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি জানেন।

— (সূরা নাহল আয়াত ১২৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্রে দাঈ ও দূত পাঠান, যারা ইসলাম প্রচার করেন এবং শান্তিপূর্ণ চুক্তির আহ্বান জানান। এই দাওয়াত ছিল কেবল ধর্মীয় নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম।

৫ হিজরির পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের জন্য বিশ্ব নেতাদের কাছে চিঠি পাঠান, তিনি সাহাবীদের মাধ্যমে চিঠি পৌঁছে দেন। হেরাক্লিয়াস (রোমান সম্রাট), কিসরো (পারস্য সম্রাট), নাজাশি (হাবশার রাজা) ও মুকাওকাস (মিশরের শাসক)। চিঠিতে লিখা ছিল- ইসলাম গ্রহণ করো তুমি নিরাপদ থাকবে আল্লাহ তোমাকে দিগুন পুরস্কার দেবেন -(সহিহ মুসলিম হাদিস ১৭৭৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ছিল নম্রতা, যুক্তি ও প্রজ্ঞার সমন্বয়। তিনি কখনো জুড়-পূর্বক ধর্ম চাপিয়ে দেননি, বরং তিনি বলেন - তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করে। -(সুনান তিরমিজ হাদিস ২৬৭৪)

দাওয়াতের ফলাফল - নাজাশি ইসলাম গ্রহণ করেন, এবং মুসলিমদের আশ্রয় প্রধান করেন। মুকাওকাস সম্মানজনক উত্তর দেন এবং উপহার পাঠান। হেরাক্লিয়াস চিঠি পড়ে মুগ্ধ হন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিসরো চিঠি ছিড়ে ফেলেন, হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন। - আল্লাহ তার রাজত্ব ছিন্ন করবেন। -(সহীহ বুখারী হাদিসটার ৪৪২৪)

ছোট ছোট অভিযান (সারিয়াহ)

ইসলামী ইতিহাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের মধ্যে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় - গাযওয়া, যেখানে নবী করিম সাঃ নিজে উপস্থিত ছিলেন। আর সারিয়াহ, যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নিজে উপস্থিত ছিলেন না, বরং সাহাবীদের পাঠাতেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ছোট ছোট অভিযানগুলো

ছিল - ইসলাম প্রচার ও দাওয়াত, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন, চুক্তি রক্ষা ও বিশ্বাসঘাতকতার জবাব। গোত্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন ও শত্রুদের আগ্রাসন প্রতিরোধ ।

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍۢ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍۢ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
٦٠

আর তাদেরকে মুকাবালা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ কর তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কক্ষনো যুলম করা হবে না।

— (সূরা আল আনফাল আয়াত ৬০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর দাওয়াতি অভিযানে সাহাবীদের পাঠানো হয় বিভিন্ন গোত্রে যেমন -

- আল মুনযির ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু - বীর মাউনার দাওয়াত।
- আসিম ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু -রাজি ট্রাজিডির দাওয়াত।
- আমার ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু - গোত্রীয় শান্তি প্রতিষ্ঠা।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরতের পর মুসলমানরা মদিনায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা এই রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পারেনি। বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়। মুসলমানরা মক্কা থেকে বিতাড়িত হলেও তাদের হৃদয়ে কাবা ও ওমরাহর আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কাবা তাওয়াফের জন্য বেকুল ছিলেন। ৬ হিজরীতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখেন, যেখানে তিনি সাহাবীদের সঙ্গে কাবা তাওয়াফ করছেন। এই স্বপ্ন ছিল ওহীর অংশ, যা তাকে ওমরাহর উদ্দেশ্যে যাত্রার অনুপ্রেরণা দেয়। - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি স্বপ্ন দেখেছি আমরা নিশ্চিন্তে কাবা তাওয়াফ করছি।-(সহিহ বুখারী হাদিস ৪১৭৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম সাহাবীদের প্রস্তুত করেন, এবং ১৪ হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ইহরাম অবস্থায় মক্কার দিকে যাত্রা করেন। তাদের সঙ্গে ছিল কুরবানীর পশু, শান্তির বার্তা এবং কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না। মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করতে না পেরে হুদাইবিয়া

নামক স্থানে অবস্থান নেন। সেখানে তারা শান্তিপূর্ণভাবে চুক্তির প্রস্তাব দেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কুরাইশদের কাছে দূত হিসেবে পাঠান, যাতে তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করেন।
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এতে সাহাবীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে সাহাবীদের কাজ থেকে বাইয়াতুর রিজওয়ান (সন্তুষ্টির শপথ) গ্রহণ করেন, যেখানে তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করার শপথ করেন।
لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ۞ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٨

মু’মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়‘আত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন নিকট আসন্ন বিজয়।
—(সুরা আল ফাতহ আয়াত ১৮)
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও কুরাইশরা সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে সুহাইল ইবনে আমর - কে চুক্তির জন্য পাঠায়। দীর্ঘ আলোচনার পর দশ বছরের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।
যুক্তির কিছু শর্ত মুসলমানদের জন্য আপাত অপমানজনক মনে হলেও, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তা গ্রহণ করেন। সাহাবীরা হতাশ হন, বিশেষত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করেন - হে রাসুল! আমরা কি সত্যের পক্ষে আর তারা কি মিথ্যার পক্ষে? আমরা কেন অপমান সহ্য করব। -(সহীহ মুসলিম হাদিস ১৭৮৪)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - আমি আল্লাহর রাসূল আমি তার আদেশ অমান্য করি না চুক্তির পর আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ফাতহ নাজিল করেন, যাতে এই চুক্তিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়।
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ١

আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়।
—(সূরা আল ফাতহ আয়াত ০১)
এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল পুনরুদ্ধার হয়, এবং তারা বুঝতে পারেন, চুক্তির মাধ্যমে বিজয়ের পথ সুগম হয়েছে।
খায়বার অভিযান

৬ হিজরি হুদাইবিয়ার সন্ধির পর, থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খায়বার ছিল ইহুদি গোত্রের শক্তিশালী দুর্গ। বনু নাযিরের বহিষ্কৃত নেতারা এখানে অশ্রয় নিয়ে মদিনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র শুরু করে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হুমকি মোকাবেলায় খায়বার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। -(ইবনে হিশাম সিরাত খন্ড ২)

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৬০০০ সাহাবীকে নিয়ে খায়বারের দিকে রওনা হন। তিনি সিবা বিন উরফুযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনায় স্থলাভিষিক্ত করেন। অভিযানে আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রধান সেনাপতি, যিনি মারহাব নামক ইহুদী যোদ্ধাকে হত্যা করেন। - কাল আমি সেই ব্যক্তিকে পতাকা দেবো যিনি আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন। - (সহিহ বুখারী হাদিস ৩০০৯ - সহিহ মুসলিম হাদিস ২৪০৭)

খায়বারের ছিল ৯ টি দুর্গ, যার মধ্যে কামুস দুর্গ ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মুসলিম বাহিনী একে একে দুর্গগুলো অবরোধ করে, এবং বিজয় অর্জন করেন। যুদ্ধ শেষে ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি হয় - তারা জমিতে কাজ করবে, মুসলিমরা ফসলের অর্ধেক পাবে। (- মুসনাথ আহমদ হাদিস ১৪৬৭৮- সহীহ বুখারী হাদিস ৪০৩০)

এই অভিযানের সময় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন, এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন - আমি খায়বারে এসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, এবং তিনি আমাকে গনিমতের অংশ দেন। -(সহীহ বুখারী হাদিস ২৬১৯)

মুসলিমরা খায়বারের খেজুর বাগান ও জমি থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। ইহুদিরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা গ্রহণ করে। মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সাময়িক প্রভাব স্বৃদ্ধি পায়।

মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি

৬ হিজরিতে সংঘটিত হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে দশ বছরের শান্তি চুক্তি, কিন্তু মাত্র দুই বছর পর কুরাইশদের মিত্র গোত্র বনু বকর মুসলিম মিত্র বনু খুজায়া -কে রাতের আঁধারে আক্রমন করে, এবং হত্যা করে। কুরাইশরা এই হামলার সহায়তা করে যা ছিল চুক্তি ভঙ্গের স্পষ্ট প্রমান।

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ٢٧

আল্লাহ তাঁর রসূলকে প্রকৃত সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্য অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, মস্তক মুন্ডিত অবস্থায় ও চুল কেটে,

ভয়ভীতিহীন হয়ে। আল্লাহ জানেন, যা তোমরা জান না। (সেই স্বপ্ন তো পূর্ণ হবেই) তদুপরি তিনি দিলেন (হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে) নিকটাসন্ন বিজয়।
— (সূরা ফাতহ আয়াত ২৭)
চুক্তির রক্ষার জন্য আবু সুফিয়ান মদিনায় এসে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সন্ধি নবায়নের অনুরোধ করেন। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাবে সাড়া দেননি। আবু সুফিয়ান সাহাবিদের কাছে গিয়ে ও ব্যর্থ হন। এতে কুরাইশরা বুঝে যায় মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। -(সহিহ বুখারী হাদিস ৪২৮০)
এই দিকে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ত গোপনীয়তায় প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি ১০০০০ সাহাবিকে সমবেত করেন। মদিনার আশপাশের গোত্রগুলোকে অংশগ্রহনে আহবান জানান, - আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কুরাইশদের সংগ্রহে নিয়োজিত করেন। হাজাইকা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার পাশে পাঠান, যেন শত্রুপক্ষ প্রস্তুত হতে না পারে। - নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ মক্কাকে আমার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে জয় করবেন। -(সহিহ মুসলিম হাদিস ১৭৮০)
এক সাহাবী হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশদের কাছে একটি চিঠি পাঠান, যাতে মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মিকদাদ
রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাঠিয়ে চিঠি উদ্ধার করেন। হাতিব বলেন, - আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, বরং আমার পরিবারকে রক্ষা করতে চেয়েছি, রাসূল সাঃ তার ইচ্ছা ঈমান যাচাই ক্ষমা করে দেন। -(সহীহ বুখারি হাদিস ৪২২৪)
মুসলিম বাহিনী মক্কার চারপাশে অবস্থান নেয়, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন প্রত্যেক সৈন্য যেন আগুন জ্বালায়, যাতে শত্রুপক্ষ বাহিনীর সংখ্যা দেখে ভীত হয়।
মক্কা বিজয় ও পরবর্তী ঘটনা
মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করে। ১.খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবেশ করেন। ২.আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ব দিক দিয়ে। ৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উত্তর দিয়ে প্রবেশ করেন। খালিদ রাঃ এর বাহিনীর সঙ্গে কিছু প্রতিরোধ হয় কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নির্দেশ ছিল, রক্তপাত এড়ানো। (-সহীহ বুখারী হাদিস ৪২৮২)
রক্তপাতহীন ভাবে মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি মাথা এতটাই নিচু করে রেখেছিলেন যে তার কপাল

উটের কাঁধে স্পর্শ করছিল। তার মুখে ছিল আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার ভাষা। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কাবা শরীফের প্রবেশ করেন, এবং ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণ করেন। তিনি তলোয়ার দিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন এবং বলেন-

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًۭا ٨١

বল, 'সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।'
— (সূরা ইসরা আয়াত ৮১)
মানবতা ও ক্ষমার ঘোষণা - নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কুরাইশদের সমবেত করে বলেন - হে কুরাইশ! তোমরা আজ আমার সঙ্গে কি আচরণ আশা করো? তারা বলল আপনি মহানুভব ভাই ও মহানুভব ভাইয়ের পুত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন - আজ তোমাদের জন্য কোন গঞ্জনা নেই তোমরা সবাই মুক্ত। যাও তোমরা নিরাপদ। এই বক্তব্য ছিল ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সেই ঐতিহাসিক উক্তিটির পুনরাবৃত্তি, যা তিনি তার ভাইদের বলেছিলেন -

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٩٢

সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন! তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'
— (সূরা ইউসুফ আয়াত ৯২)
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ভাষণ ছিল - ক্ষমাশীলতার ঘোষণা, মানবতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নেতৃত্বের নৈতিকতা ও উদারতা, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শান্তির আহ্বান। তিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও সহানুভূতির বার্তা দেন, যা ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতিকে তুলে ধরে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করলেও কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম অপরাধের লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পড়ে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেন যেমন - হিন্দা বিন্তে উতবা, হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এর হত্যাকারী। ইকরিমা ইবনে আবু জাহল - পরে ইসলাম গ্রহন করেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া - নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দেন। -(ইবনে হিশাম সিরাত খন্ড ২)
কাবা শরীফে সংস্কার ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠা
মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। এই বিজয় শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং এটি ছিল তাওহীদের বিজয়, শিরক ও মূর্তিপূজার অবসান, এবং কাবা শরীফ কে তার প্রকৃত পবিত্রতায় ফিরিয়ে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কাবা, যা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর স্মৃতিবাহী বহু বছর ধরে

মূর্তি পূজার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কেন্দ্রকে পুনরায় তাওহীদের আলোয় উদ্ভাসিত করেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিল্লাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি কাবার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন। কাবার ভেতরে ছিল বিভিন্ন চিত্র। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছবি। যাদেরকে মূর্তি পূজা করতে দেখানো হয়েছিল। রবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব চিত্র মুছে ফেলেন এবং বলেন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কখনো মূর্তি পূজা করেননি। - (সহীহ বুখারি হাদিস ৩৩৫১)। তিনে খাবার দেয়াল পরিষ্কার করেন এবং তাওহীদের বার্তা প্রতিষ্ঠা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বিল্লাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কাবার ছাদে উঠিয়ে আযান দিতে বলেন। এটি ছিল ইসলামের বিজয়ের প্রতীক এবং তাওহীদের ঘোষণা।

কাবা শরীফ কে তাওহীদের কেন্দ্র হিসেবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা হয় । মূর্তি পূজার অবসান ঘটে, এবং মুসলমানরা বুঝতে পারেন, ইসলাম শুধু বাহিক ও বিজয় নয়, বরং অন্তরের শুদ্ধতা ও আকিদার বিশুদ্ধতা। কাবা শরীফ সংস্কার ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর চূড়ান্ত বাস্তবায়ন। এটি প্রমাণ করে ইসলাম শুধু রাজনৈতিক নয় বরং আত্মিক নৈতিক ও আকিদা ভিত্তিক ধর্ম। কাবা আজও তাওহীদের প্রতীক, যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুসলিম আল্লাহর সামনে সিজদারত হয়।

মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্ণ ঘটনা

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ইসলামের এক শান্তি পূর্ণ বিপ্লব ঘটান। বিজয়ের পর তার প্রথম কাজ ছিল একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ধর্ম, জাতি, গোত্র, ধনী - গরিবের ভেদাভেদ থাকবে না।

মক্কাবাসীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে বহু বছর ধরে নির্যাতন চালিয়েছিল।মক্কা বিজয়ের পর প্রতিশোধ নয় বরং পূর্ণমিলনের পথ বেছে নেন। এতে সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতির্ষ্ঠিত হয়।

গোত্র ভিত্তিক বৈষম্যের অবসান - আরব সমাজে গোত্র ছিল সামাজিক শ্রেণী বিভাগের প্রধান ভিত্তি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ঘোষণা করেন- কোন আরবের উপর অনারবের কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই- শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়া ভিত্তিতে। - (মুসনাদ আহমদ হাদিস ২৩৪৮৯) এই বক্তব্য গোত্রীয় অহংকার ও জাতিগত বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ করে এটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মক্কাকে মদিনা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি কাবা

শরীফের দায়িত্বে উসমান ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বহাল রাখেন। যিনি পূর্বেও কাবার চাবি রক্ষক ছিলেন। -আজ থেকে চাবি তোমার কাছেই থাকবে কেউ তা তোমার কাছ থেকে নিতে পারবে না - (ইবনে মাজাহ হাদিস ২৯৪৭)। এই সিদ্ধান্ত ছিল প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা ও আস্থার প্রতীক।

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার - নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ঘোষণা করেন যে, আইন সবার জন্য সমান। তিনি বলেন- যদি আমার কন্যা ফাতিমা ও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম। -(সহিহ বুখারী হাদিস ৩৪৭৫)। এই বক্তব্য ছিল আইনের শাসনের প্রতি তার অঙ্গীকার, যা সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতাবানদের আইনের আওতায় আনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

নারীর মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা - মক্কার বিজয়ের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নারীদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। তিনি বলেন - তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে। -(তিরমিজি হাদিস ১১৬২) । নারীদের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চিত করে তিনি একটি মানবিক সমাজ গঠে তুলেন, যেখানে নারী ছিল সম্মানিত ও সুরক্ষিত।

দাস প্রথার বিলুপ্তি- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস কে মুক্তি দিতে উৎসাহ দেন, এবং বলেন - যে ব্যক্তি কোন দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবে। -(সহিহ মুসলিম হাদিস ১৫০৯)। এই নীতির মাধ্যমে তিনি ধাপে ধাপে দাস প্রথা বিলুপ্তির পথ তৈরি করেন, এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে যে সামাজিক রাজনৈতিক পূর্ণগঠন হয়েছিল, তা ছিল এক বিপ্লবী পরিবর্তন। তিনি ধর্মীয় সংস্কার, গোত্রীয় বিভাজন বিলুপ্তি, আইনের শাসন, নারীর অধিকার, দাস মুক্তি এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। একটি ন্যায় ভিত্তিক মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

হুনাইন যুদ্ধ

৮ হিজরির রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের প্রভাব আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের মধ্যে গোত্রের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তারা আশঙ্কা করে মুসলিম বাহিনী তাদের উপরও আক্রমণ চালাতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই তারা আগেভাগে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের সেনাপতি ছিলেন মান ইবনে আওফ অন-নাসরি তিনি ছিলেন তরুণ, সাহসী কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন নেতা। তিনি এক অদ্ভুত কৌশল গ্রহণ করেন - নারী, শিশু ও পশ্যসম্পদকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসেন, যাতে সেনারা পিছু হাটতে না পারে। এই কৌশল অভিজ্ঞ সাহাবী দুরাইদ ইবনে সামা (যিনি তখন বৃদ্ধ ছিলেন) দ্বারা সমালোচিত হয় তিনি

বলেন - নারী ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করা দুর্বলতা ও পরাজয়ের লক্ষণ। - (আর রাহীকুল মাখতুম - পৃ ৪৭৫)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর প্রায় ১২০০০ সৈন্য নিয়ে হুনাইনের দিকে অগ্রসর হন । এই বাহিনীর মধ্যে ছিলেন, পুরাতন সাহাবীগণ (মুহাজির ও আনসার) ও সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাবাসী। এই বিশাল বাহিনী দেখে কিছু মুসলিম আত্মবিশ্বাসে বলেন - আজ আমরা পরাজিত হবো না। মহান আল্লাহ তা'আলা এই তুষ্টিকে সংশোধন করেন এবং বলেন -

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ٢٥

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদেরকে বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন আর হুনায়নের যুদ্ধের দিন, তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদেরকে গর্বে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, যমীন সুপ্রশস্ত হওয়া সত্বেও তা তোমাদের নিকট সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পিছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে।

—(সূরা তাওবা আয়াত ২৫)

মুসলিম বাহিনী যখন হুনাইন উপত্যকায় সংকীর্ণপথে প্রবেশ করে, তখন শত্রুপক্ষ আকস্মিক ভাবে তির বর্ষণ শুরু করে। মুসলিম বাহিনীর একাংশ বিভ্রান্ত হয়ে পিছু হটে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার পাশে মাত্র কয়েকজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন। এই সংকটময় মুহূর্তে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খচ্চরের পিঠে দাঁড়িয়ে সাহাবীদের সঙ্গে ঘোষণা করেন - আমি নবী এতে কোন মিথ্যাচার নেই, আমি আব্দুল মুত্তালিব এর বংশধর।-(সহিহ মুসলিম হাদিস ১৭৭৫)

রাসুল সাঃ তার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আনসারদের ডাকতে বলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উঁচু কণ্ঠে বলেন - হে আনসারগণ! হে বাইআতের সাহাবীগণ তোমরা কোথায় -(আর রাহীকুল মাখতুম)। সাহাবীগণ ফিরে আসেন, যুদ্ধ পুনরায় সংঘটিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে।

হুনাইন যুদ্ধের বন্দি ও মুক্তি

হুনাইন যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল ও বন্দী অর্জন করে। বন্ধুদের মধ্যে ছিল প্রায় ৬০০০ নারী ও শিশু, যাদের ঐ অংশই হাওয়াজিন গোত্রের অন্তর্গত। মুসলিম বাহিনী বন্দিদের ও গনিমতের মাল মক্কা থেকে জিরানা নামক স্থানে নিয়ে যায়,

যেখানে তা সংরক্ষিত রাখা হয়। যুদ্ধের কয়েকদিন পর হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসেন । ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী এবং নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীদের মুক্তির আবেদন জানায়। তারা বলেন - হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি আমাদের সন্তান ও স্ত্রীদের ফিরিয়ে দিন। -(আবু দাউদ হাদিস ২৬৯১)। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন শুনে বলেন - তোমাদের জন্য দুটি পথ রয়েছে, ১.তোমরা চাইলে বন্দিদের ফিরিয়ে দেই, কিন্তু গনিমতের মাল তোমাদের নয়। ২.চাইলে গনিমতের মাল রেখে দেই, কিন্তু বন্দিরা মুক্ত হবে না। -(ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৪৮৫)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে সাহাবীদের মতামত জানতে চান তিনি বলেন - আমি তোমাদের বন্দিদের ফিরিয়ে দিতে চাই তোমরা কি এতে সম্মত? সাহাবীগণ এক বাক্যে বলেন আমরা আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তের সন্তুষ্ট -(আর রাহীকুল মাখতুম ৪৮১)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের মুক্তির ঘোষণা দেন। যারা গনিমতের মাল পেয়েছিলেন তাদের কাছে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - তোমরা চাইলে তোমাদের অংশ রেখে দাও, চাইলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফিরিয়ে দাও। অধিকাংশ সাহাবী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্দীদের ফিরিয়ে দেন।

মন্দিরা মুক্তি পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দয়া প্রশংসা করে। এই ঘটনা ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয় খুলে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়ার কারণে হাওয়াজিন গোত্রের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন -(ইবনে কাসির আল বিদায় ওয়ান নিহায়া খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ৩৭৫)

তায়েফ অভিযান

হুনাইন যুদ্ধের বিজয়ের পর ইসলামের প্রভাব আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো গভীর ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের প্রতিরোধ ভেঙে দেয়। কিন্তু সাকিফ গোত্রের প্রধান তায়েফ তখনো ইসলামের বাহিরে ছিল। তায়েফ ছিল এক সমৃদ্ধসহ শক্তিশালী দুর্গ, সুসজ্জিত সেনাবাহিনী এবং ইসলাম বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল।

হুনাইন যুদ্ধের পর হাওয়াজিন গোত্রের অবশিষ্ট সেনারা তায়েফে আশ্রয় নেয়। তাদের সঙ্গে ছিল মালিক ইবনে আউফ, যিনি হাওয়াজিনের নেতা ছিলেন। তায়েফের সাকিফ গোত্র তাদের আশ্রয় দেয়, এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলায় তায়েফ অভিযানের প্রস্তুতি নেন - তায়েফ ছিল একটি

দুর্গম নগরী, যার চার পাশে প্রাচীন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। -(আর রাহীকুল মাখতুম পৃষ্ঠা ৪৮২)

তায়েফ অভিযানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতি কৌশল ছিল অত্যন্ত মানবিক ও দূরদর্শ। তিনি বলেন - হে আল্লাহ! তুমি তাইফ বাসীদের হিদায়াত দাও। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই দোয়া প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ প্রতিপক্ষের ধ্বংস নয়, বরং হিদায়াত কামনা করতেন, এটি ছিল ইসলামের দাওয়াতের মূলনীতি। তায়েফ ধ্বংস করতে আসিনি, বরং হিদায়েত দিতে এসেছি, এই শিক্ষা সাহাবীদের মধ্যে ধৈর্য, কৌশল ও দাওয়াতী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, যা পরবর্তী খেলাফত যুগে কার্যকর ভাবে প্রয়োগ হয়। তায়েফ অভিযানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে ছিল ধৈর্য, দয়া ও কৌশলের সমন্বয় । তিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে দাওয়াতকে প্রাধান্য দেন। এই নেতৃত্বের মডেল পরবর্তী যুগে মুসলিম শাসকদের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে। - নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ বাসীদের ওপর জোর প্রয়োগ না করে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং সময় দেন। -(ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী খণ্ড ২পৃষ্ঠা ৪৯২)।

তায়েফ অভিযান সাময়িক দিক থেকে তাৎক্ষণিক সফল না হলেও, এর পরবর্তী প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য, দয়া ও কৌশল ইসলামী দাওয়াত ও রাজনীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে । এই অভিযানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, ইসলাম শুধু শক্তির নয়, বরং নৈতিকতা, সহনশীলতা ও মানবিকতার ধর্ম ।

ইসলামের বিস্তার ও গোত্র ভিত্তিক সম্পর্ক

আরব সমাজ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব এর সময় ছিল একটি গোত্র ভিত্তিক কাঠামোয় বিভক্ত। প্রতিটি গোত্র ছিল সত্যান্ত, আত্মনির্ভরশীল ও গর্বিত। এই সমাজ ব্যবস্থা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল গোত্র নেতাদের হাতে। ইসলাম যখন এই সমাজে আত্মপ্রকাশ করে , তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোত্র ভিত্তিক সম্পর্ককে কৌশলগতভাবে ব্যবহৃত করে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেন।

নবুয়তের প্রথম দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম দাওয়াত শুরু করেন নিজগুত্র বনু হাশিম থেকে। যদিও তার চাচা আবু তালিব তাকে রক্ষা করতেন, তবুও গোত্রের অধিকাংশ সদস্য ইসলাম গ্রহণে অনির্ভুক্ত ছিল। কুরাইশ যারা মক্কার নেতৃত্বে ছিল, দ্বারা ইসলামকে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য হুমকি মনে করে, ফলে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে ও তার অনুসারীদের নির্যাতন শুরু করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বুঝতে পারেন গোত্রীয় সম্পর্কে উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার সম্ভব নয়। তাই তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে দাওয়াত দেন বিশেষ করে হজ্জের

মৌসুমে তিনি বিভিন্ন গোত্রের তাবুতে গিয়ে ইসলাম প্রচার করতেন । আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ধি ছিল গোত্র ভিত্তিক দাওয়াতের সফল উদাহরণ।
আওস ও খাজরাজ গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর মদিনায় ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ভিত্তি স্থাপন করে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে হিজরতের আগমন জানায় এবং মুআখাত (ভ্রাতৃত্ব) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুহাজিরদের আশ্রয় দেন।
বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের পর হাওয়াজি,ন সাকিফ, তামীম,আবদে কায়েস প্রভৃতি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাদের সঙ্গে সন্ধি ও প্রতিনিধিদল বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলেন।
গোত্র ভিত্তিক সম্পর্কের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব - ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিম মজবুত হয় গোত্রীয় আনুগত্যের মাধ্যমে।
-দাওয়াতের গতি বৃদ্ধি পায় গোত্র নেতাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে।
সামাজিক বৈষম্য দূর হয় কারণ ইসলাম ঘোষণা করে।
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।
— (সূরা হুজরাত আয়াত ১৩)
তাবুক অভিযান
৯ হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত তাবুক অভিযান ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জীবনের সর্বশেষ সাময়িক অভিযান। এটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। যদিও সরাসরি যুদ্ধ হয়নি তবে এই অভিযানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান, নেতৃত্বের পরিপক্কতা এবং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর সুসংহত হয়।
বাইজেন্টাইন সম্রাজ্য (রোমান) তখন আরব সীমান্ত সেনা সমাবেশ করছিল বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তারা ইসলামকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্ভাব্য আগ্রাসনের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।
তাবুক অভিযান ছিল কঠিনতম অভিযানের একটি। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল তীব্র গরম, পথ ছিল দীর্ঘ (প্রায় ৭০০ কিলোমিটার) । খরার কারণে খাদ্য ও প্রাণীর সংকট। এবং গনিমতের নিশ্চয়তা ছিল না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের প্রস্তুতির আহ্বান

জানান, অনেক সাহাবীর সাড়া দেন। আবার কিছু মুনাফিক নানা অজুহাত দেখিয়ে অংশগ্রহণ করেননি।

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَـٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَـٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ٨١

(তাবুক অভিযানে) যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তারা রসূলের বিরোধিতায় বসে থাকাতেই আনন্দ প্রকাশ করেছিল আর তাদের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে তারা অপছন্দ করেছিল। তারা বলেছিল, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বেরিও না’। বল, ‘জাহান্নামের আগুনই তাপে প্রচন্ডতম’। তারা যদি বুঝত!

— (সূরা তওবা আয়াত ৮১)

প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের দিকে রওনা হন। এটি ছিল তার সর্ব বৃহৎ বাহিনী। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনায় দায়িত্বে রেখে যান, যা নিয়ে কিছু লোক কটুক্তি করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - তুমি আমার জন্য ঠিক ততটাই - যতটা হারুন ছিল মূসার জন্য, তবে আমার পরে কোন নবী নেই -(সহিহ বুখারি হাদিস ৪৪১৬)

তাবুক অভিযানে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদে বাইজেন্টাইন সেনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা মুখোমুখি সংঘর্ষে আসেনি। তারা সীমান্তে অবস্থান করলেও মুসলিম বাহিনীর সাহসিকতা ও নেতৃত্ব দেখে তারা পিছু হটে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পৌঁছে ২০ দিন অবস্থান করেন কিন্তু রোমানবাহিনী যুদ্ধের সাহস করেনি। -(ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৫১০)। এটি ছিল একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক বিজয়, যা ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা ও প্রভাব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করে।

তাবুক অবস্থান কালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশপাশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও গোত্রের নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য :- আইলা নগরীর খ্রিস্টান শাসক ইউহনা ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্ধি করেন এবং জিজিয়া এ সম্মত হন।

- আজরুহ ও জারবা অঞ্চলের নেতারা মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কূটনৈতিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করেন। এই চুক্তিগুলো ইসলামের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক গীতি সূচনা হিসেবে বিবেচিত।

তাবুক অভিযান অংশগ্রহণ ছিল কঠিন ও আত্মত্যাগমূলক। এই অভিযানে প্রকৃত ঈমানদার ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। যারা অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে থাকে তাদের

সম্পর্কে কুরআনেও বলা হয়েছে। -(সূরা তাওবা আয়াত ৮১) এই আয়াত মুনাফিকদের মানসিকতা ও ঈমানহীনতার পরিচয় তুলের ধরে।

তিনজন সাহাবী - কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুরারাহ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহু, অভিযানে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মিথ্যা বলেননি। তারা সত্য স্বীকার করেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে ৫০ দিন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখেন। পরে মহান আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করেন - وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই-অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।-(সূরা তওবা আয়াত :১১৮)। এই ঘটনা মুসলিম সমাজে সত্যবাদীতার মর্যাদা ও আল্লাহর দয়ার নিদর্শন হয়ে আছে।

বিদায় হজ ও ভাষণ

হিজর ১০ সালের জিলহজ্ব মাসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তার জীবনের প্রথম ও শেষ হজ পালন করেন। এই হজ ইতিহাসে হজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এটি ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণার মুহূর্ত যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাখো সাহাবীদের সামনে একটি ভাষণের মাধ্যমে মানবতার ন্যায়ের, নারী, পুরুষের মর্যাদা এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি তুলে ধরেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মদিনা থেকে হজ পালনের ঘোষণা দেন। তার আহবানে সাড়া দিয়ে প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার সাহাবী তার সঙ্গে হজে অংশগ্রহণ করেন । তিনি ২৫ জিলকদ মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং আট জিলহজ্ব মক্কায় পৌঁছে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। নয় জিলহজ, শুক্রবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরাফাতের ময়দানে উরানাহ উপত্যকায় লাখো সাহাবীদের সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষনটি ছিল সংক্ষিপ্ত নয়, বরং গভীর ও বহুমাত্রিক। নিজে ভাষণের মূল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হলো -

- ইসলামের পূর্ণতা বিদায় হজের ভাষণের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত পাঠ করেন-

● حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহকৃত পশু, আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনের ফলে মৃত, সংঘর্ষে মৃত আর হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু- তবে জীবিত পেয়ে যা তোমরা যবহ করতে পেরেছ তা বাদে, আর যা কোন আস্তানায় (বা বেদীতে) যবহ করা হয়েছে, আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা (এগুলো তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে)। এসবগুলো পাপ কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম। তবে কেউ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় (নিষিদ্ধ বস্তু খেতে) বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — (সূরা আল মায়িদা আয়াত ৩)। এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নবুয়তের ধারাবাহিকতার সমাপ্ত হয়। পূর্ববর্তী যুগে মুসলিম সমাজ এই আয়াতকে ইসলামে আইন, নৈতিকতা ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

● মানবাধিকার ও সামাজিক নের ভিত্তি - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন আজকের দিন, এই মাস এই শহর পবিত্র -(সহিহ বুখারী হাদিস ১৭৩৯)। এই ঘোষণা ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পদের নিরাপত্তা এবং সম্মানের অধিকার কে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিতে পরিণত করে । পরবর্তী যুগে খিলাফত ও মুসলিম শাসক ব্যবস্থায় এই নীতির ভিত্তিতে বিচার ও প্রশাসন পরিচালিত হয়।

● বর্ণ গোত্র ও শ্রেণীভিত্তিক বৈষম্যের অবসান - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - হে মানুষ! তোমাদের রব একজন, তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আমাকে সৃষ্টি মাটি থেকে। কোন আরবের উপর অনারবের একাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই - তাকওয়া ছাড়া। -(সহিহ মুসলিম হাদিস 1218)। এই ঘোষণা গোত্র ভিত্তিক আরব সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে বর্ণ, ভাষা ও জাতিগত পার্থক্যকে অগ্রাহ করে, তাকওয়াকে মর্যাদার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

- নারীর অধিকার ও পারিবারিক নীতিমালা - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন - নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যব্যবহার কর, তারা তোমাদের অধীনে আছে, কিন্তু আল্লাহর আমানত। - (সনান আবু দাউদ হাদিস ১৯০৫)। এই ঘোষণা নারীর অধিকার, মর্যাদা ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তী যুগে ইসলামী আইন ও সমাজে নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।
- অর্থনৈতিক ন্যায় ও সুদ নিষিদ্ধকরণ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - আজ থেকে সব ধরনের সুদ বাতিল করা হলো। আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর সুদ প্রথমে বাতিল করলাম - ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৫২০)। এই ঘোষনা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করে, যেখানে সুদ নিষিদ্ধ এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তী যুগে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায়।
- দাওয়াত ও বিশ্বজনীন বার্তা - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - যারা উপস্থিত আছে, তারা যেন অনু উপস্থিতদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়, কারণ অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তি হয়তো উপস্থিতদের চেয়ে বেশি বুঝবে। -(সহিহ বুখারি হাদিস ১৭৪১)। এই নির্দেশনা ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বজনীন করে তোলে। সাহাবীগণ এই ভাষণকে বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেন, যার ফলে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে।
- সুন্নাহর ভিত্তি ও হজের রীতিনীতি - বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের প্রতিটি রুকন সুন্নাহর ভিত্তিতে পালন করেন। যা পরবর্তী যুগে মুসলিমরা তার অনুসরণে হজ পালন করে, এবং হজের বিধান ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সংরক্ষিত হয়। - তোমরা আমার কাছ থেকে হজের রীতিনীতি শিখে নাও, কারন আমি জানিনা, এরপর হয়তো তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না । -(সহিহ মুসলিম হাদিস 1218)

বিদায় হজের ভাষণ ছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তের চূড়ান্ত ঘোষণা। যা ইসলামের পূর্ণতা ও মানবতার নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে। এই ভাষণ শুধু একটি ধর্মীয় উপদেশ নয় , বরং এটি ছিল নৈতিক সংবিধান, যা পরবর্তী যুগে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করেছে।

মোহাম্মদ সাঃ এর শেষ জীবন ও অসুস্থতা

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াত জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল, একদিকে দাওয়াত ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পূর্ণতা, অন্যদিকে বিদায়ের প্রস্তুতি। হিজরি **১১** সালে

রবিউল আউয়াল মাসে তার অসুস্থতা শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত তার ইন্তেকালের দিকে নিয়ে যায়। এই সময়কাল ছিল উম্মতের জন্য শিক্ষা, নেতৃত্ব, ধৈর্য ও ঈমানের পরীক্ষার সময়।
বিদায় হজের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন, এবং উম্মতের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বীনী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো সুসংহত করেন, যাকাত আদায়ের জন্য কর্মী নিয়োগ করেন, এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতি চিঠি পাঠান। - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের পর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দাওয়াতি কার্যক্রমে আরও সক্রিয় হন। -(আর রাহিকুল মাখতুম পৃষ্ঠা ৫২৫)
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরি ১১ সালের সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি তার স্ত্রী মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে ছিলেন, অসুস্থতা শুরু হয় জ্বরও মাথাব্যথা দিয়ে। তিনি বলেন - আমি খায়বরের বিষের যন্ত্রণা এখনো অনুভব করছি। -(সহীহ বুখারি হাদিস ৪৪১২) খয়বারের যুদ্ধের পর এক ইহুদী নারী তাকে বিষ মিশ্রিত ভেড়ার মাংস খাওয়ায়। যার প্রভাব দীর্ঘদিন পর ফিরে আসে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে চলে যান।
অসুস্থতার সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড জরে ভুগছিলেন। তিনি মাথায় কাপড় বেঁধে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সহায়তায় মসজিদে আসতেন, এবং সাহাবীদের সঙ্গে নামাজ আদায় করতেন। - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় কাপড় বেঁধে, দুই সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন।-(সহিহ মুসলিম হাদিস ৪১৮)
তিনি আরও বলেন- আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ। - (সুনান ইবনে মাজাহ হাদিস ২৬৯৭) অসুস্থতার সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বুঝতে পারেন তিনি হয়তো আর নামাজে ইমামতি করতে পারবেন না, তাই তিনি নির্দেশ দেন- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বল তিনি যেন মুসলিমদের নামাজ পড়ান। -(সহিহ বুখারি হাদিস ৬৮০)। যদিও কিছু সাহাবী চেয়েছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামতি করুন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর দিয়ে বলেন - আবু বক্কর ই উত্তম। -(সহিহ মুসলিম হাদিস ৪১৯)। এই নির্দেশনা ছিল ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত যা পরবর্তীতে খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম অসুস্থতার সময় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন - আল্লাহ একজন বান্দাকে দুনিয়া ও তার কাছে থাকার মধ্যে পছন্দের সুযোগ দিয়েছেন সে আল্লাহকে পছন্দ করেছে। -(সহিহ বুখারী হাদিস ৪৪৩৫) এই কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

কাঁদতে শুরু করেন, কারণ তিনি বুঝে যান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ের ঘোষণা দিচ্ছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের প্রতি শেষ উপদেশ - নামাজ, নামাজ, আর তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। -(সুনান আবু দাউদ হাদিস ৫১৫৬)। তিনি আরও বলেন -আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি -আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ, যদি তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরো, কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। -(মুয়াত্তা মালিক হাদিস ১৬২৮)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ইন্তেকাল ও দাফন

হিজরী ১১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় ১৩ দিন ধরে তিনি অসুস্থতায় ভুগেন এবং রবিউল আউয়াল মাসেই সোমবার সকালবেলায় ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকাল ছিল নবুয়তের সমাপ্তি এবং উম্মতের জন্য এক চিরন্তন নির্দেশনা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি আয়েসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা রেখে ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন, আমি তার মুখে পানি ঢালছিলাম। -(সহীহ মুসলিম হাদিস ৪৪৬০)। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ কথা ছিল - আল্লাহর সঙ্গে রফিকুল আলা (উচ্চতম সংগীত) এর সঙ্গে।-(সহিহ বুখারি হাদিস ৪৪৩৬)। এই মুহূর্তেই তার চোখ স্থির হয়ে যায়, এবং পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মদিনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন -যে বলবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন, আমি তাকে হত্যা করব। তিনি মুসার মত আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। -(সহিহ বুখারি হাদিস ১২৪১) তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহসিকতার সঙ্গে বলেন -

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ ١٤٤

মুহাম্মাদ হচ্ছে একজন রসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে আরও অনেক রসূল গত হয়েছে; কাজেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টাদিকে ঘুরে দাঁড়াবে? এবং যে ব্যক্তি উল্টাদিকে ফিরে দাঁড়ায় সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে অতিশীঘ্র বিনিময় প্রদান করবেন।

— (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৪৪) এই আয়াত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঠ করলে সাহাবীরা বাস্তবতা মেনে নেন ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল করিয়ে দেন - আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, কাসম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় খোলা হয়নি, বরং জামার উপর থেকেই পানি ঢেলে গোসল দেওয়া হয়।

-তাকে তিনটি সাদা ইমানী কাপড়ে দাফন দেওয়া হয়, যার মধ্যে কোন কুর্তা বা পাগড়ি ছিল না। -(সহিহ বুখারি হাদিস ১২৭৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিম আরামবাহ (শান্তি শয্যা) সম্পর্কে সাহাবীগণ এর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে কোন নবীকে পৃথিবী থেকে উঠানো হয়নি (মৃত্যুবরণ করেননি) তাকে সেই স্থানে দাফন করা ব্যতীত যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে। এ মীমাংসার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর তার নিচে বউগুলি কবর খনন করা হলো।এরপর সাহাবীগণ পালাক্রমে দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাজা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্বপ্রথম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার বনু হাশিমের লোকজনের সালাত আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসার জানাযার সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন।

খিলাফতের সূচনা ও সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহ এক গভীর শোক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। নবুয়তের যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠে - কে হবেন উম্মতের নেতা? এই সংকটময় মুহূর্তে সাহাবীদের বিচক্ষণতা, পরিপক্কতা ও ঐক্য ইসলামিক খেলাফতের ভিতি স্থাপন করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাফনের আগেই আনসারগন সাফিফা বনু সাঈদা নামক স্থানে একত্রিত হন। তারা নিজেদের মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচনের চিন্তা করেন। তারা প্রস্তাব করেন - আমরা একজন নেতা দিব তোমরা একজন নেতা দাও। -(ইবনে হিশাম সিরাতুন্নবী খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৫৪৫) এই সংবাদ পেয়ে মুহাজিরগণ - আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ও আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের নেতা

ছিলেন, তাই নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যেই থাকা উচিত। -(আল বিদায়য়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসির খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৪০০)

তিনি প্রস্তাব করেন - আমি এবং আবু উবাইদা বা ওমরকে খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দিচ্ছি -(সহীহ বুখারি হাদিস ৩৬৬৭)। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাত ধরে বলেন - আপনি আমাদের নেতা, আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী, আমরা আপনাকেই খলিফা মানি। -(ইবনে সাদ তাবাক্কাতুল কোবরা খন্ড তিন পৃষ্ঠা ১৮২) এরপর সবাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে বায়াত করেন।

আনসারগণ প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন, কারণ তারা মদিনার অধিবাসী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যুক্তি ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ধীরতা দেখে তারা একমত হন। -আনসার গন বলেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একমত হচ্ছি। -(ইবনে হিশাম খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৫৪৬)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম দিকে বায়াত করেন নি, কারণ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাফন ও পরিবার সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। পরে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে গিয়ে বলেন - আমি দেরিতে বায়াত করেছি কিন্তু আমি আপনার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট। -(সহীহ বুখারি হাদিস ৪২৩০)

খিলাফতের প্রশ্নে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তা ছিল সাময়িক। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে সবাই একত্রিত হন তিনি বলেন - তোমরা যদি আমাকে সঠিক পথে দেখতে পাও, তবে আমার সাহায্য কর, আর ভুল করলে আমাকে সংশোধন করো। -(খুতবাতু আবু বকর, তারিখে খন্ড দুই পৃষ্ঠা ২৭৩)

দাওয়াতে দীপ্তি ও উম্মতের অঙ্গীকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত দাওয়াত। তার সিরাতের প্রতিটি অধ্যায় - শৈশব, নবুয়তের ঘোষণা, মক্কা - মদিনার সংগ্রাম,বিজয়, বিদায় হজ, এবং ইন্তেকাল সবই ছিল দাওয়াতের দীপ্তি। এই দীপ্তি শুধু তার সময় সীমাবদ্ধ নয় বরং তা উম্মতের জন্য একটি জীবন্ত দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন -

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
١٠٨

বল, ‘এটাই আমার পথ, আল্লাহর পথে আহবান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। আল্লাহ মহান, পবিত্র; আমি কক্ষনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হব না।
— (সূরা ইউসুফ আয়াত ১০৮)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ছিল কোরআনের আলোয় পরিচালিত, যুক্তি, দয়া ও ধৈর্যের ভিত্তিতে গড়া। তিনি কখনো জোর করেননি, বরং মানুষের হৃদয় জয় করেছেন।

দাওয়াতের দীপ্তি - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফে দাওয়াত দিতে যান, তাকে পাথর ছুড়ে রক্তাক্ত করা হয়। তখন তিনি বলেন - হে আল্লাহ তুমি তাদের হৃদয়ার দাও কারণ তারা জানে না। এই দোয়ায় প্রমাণ করে তার দাওয়াত প্রতিশোধ নয়, বরং হিদায়াতের জন্য। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বলেন - আজ তোমাদের জন্য কোন গ্লানি নেই। তোমরা মুক্ত। - তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে দাওয়াতের দীপ্তিকে বিজয়ের চেয়ে বড় করে তুলেছেন।

উম্মতের দায়িত্ব - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌছে দাও। -(সহিহ বুখারি হাদিস ৩৪৬১) এই হাদিসে উম্মতের উপর দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করে। এটি শুধু আলেমদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব।

সাহাবীদের অঙ্গীকার - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর সাহাবীরা তার দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেন - আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রিদ্দা যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি রক্ষা করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী সম্রাজ্যকে বাইজেন্টাইন সীমান্তে প্রসারিত করেন, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন সংরক্ষণ নিশ্চিত করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন ও সুন্নাহের   ভিত্তিতে দাওয়াত চালিয়ে যান। তাদের জীবন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের বাস্তব রূপ।

সিরাত গ্রন্থের সমাপ্তি

এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এক মহামানবের জীবন। যিনি ছিলেন আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল, মানবতার মুক্তিদাতা, ন্যয় ও উদয়ের প্রতীক। তার জন্ম থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত। সীরাতের আলোয় আমরা শুধু ইতিহাস জানিনি, বরং একটি আদর্শ জীবন গঠনের পথ খুঁজে পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন ছিল কোরআনের জীবন তো ব্যাখ্যা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন ছিল জীবন্ত কুরআন। -(সহিহ মুসলিম হাদিস ৭৪৬)

তিনি ছিলেন এতিম, কিন্তু বিশ্বনবী, নির্যাতিত, কিন্তু ক্ষমাশীল, বিজয়ী, কিন্তু বিনয়ী। তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের শেখায় -কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা শুধু আবেগ নয়, বরং তা কর্মে প্রকাশ পায় তিনি বলেন - তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবেনা,

যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমগ্র মানবজাতির চেয়ে অধিক নই। - (সহীহ বুখারি হাদিস ১৫৮) এই ভালোবাসা প্রকাশ পায় তার সুন্নাহ অনুসরণে, তার আদর্শে জীবন গঠনে, এবং তার দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন -

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا
٤٠

মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।
— (সূরা আহযাব আয়াত ৪০)
নবুয়তের সমাপ্তির পর উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে দিন রক্ষা ও প্রচারের দায়িত্ব।
এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর জীবন, এখন আমাদের আত্ম জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা কি তার আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করেছি?
আমি কি তার সুন্নাহকে জীবনে বাস্তবায়ন করেছি?
আমি কি তার দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি?
উক্ত প্রশ্ন গুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে গভীরতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিরাত শুধু ইতিহাস নয়, এটি একটি জীবন্ত আমানত, এটি আমাদের দায়িত্ব আমাদের পথ নির্দেশ আমাদের আত্মার আলো। এই সিরাতের আলোয় জীবন গড়াই আমাদের প্রকৃত সফলতা।
শেষ কথা - এই সিরাত গ্রন্থের সমাপ্তি নয়, বরং এটি নতুন যাত্রার সূচনা। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জীবন কি রেখে গেছেন, এবং আমরা কিভাবে তা গ্রহণ করছি। তার জীবন ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত, আমাদের জীবনে হোক সেই পথের অনুসারী।